সিরাজদ্দৌলা

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

[*দরবার কক্ষ। সিরাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট। কর্মচারীরা যথাস্থানে উপবিষ্ট। সভাসদদের মাঝে মীরজাফর, মোহনলাল, মীরমদন, রায়দুর্ল্লভ একদিকে—অন্যদিকে রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, ওয়াটস্, মঁসিয়ে লা দণ্ডায়মান।*

গোলাম হোসেন যথারীতি নবাবের পায়ের কাছে বসিয়া আছে।]

সিরাজ। ওয়াটস!

ওয়াটস। Your Excellency!

সিরাজ। কলকাতা জয়ে যখন আমরা যাত্রা করি, তখন তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গেই ছিলে। সুতরাং কলকাতা জয়ের ইতিহাস তুমি জান। তুমি জান যে কলকাতা জয় করে সেই নগরের নাম আমরা আলিনগর রাখি।

ওয়াটস। জানে Your Excellency!

সিরাজ। আলিনগরে তোমাদের কোম্পানির সঙ্গে যে সন্ধি হয়, তার সব সর্তও তোমাদের জানা আছে।

তোমাদের কোম্পানি সন্ধির সকল সর্ত যাতে রক্ষা করে তারই জন্যে প্রতিভূরূপে তোমাকে মুর্শিদাবাদে রাখা হয়েচে। কোম্পানি সন্ধি-সর্ত রক্ষা না করলে, যুদ্ধঘোষণার আগেই, তোমাকে আমরা তোপের মুখে উড়িয়ে দিতে পারি, জান?

ওয়াটস। জানে Your Excellency!

সিরাজ। তুমি প্রস্তুত হও।

ওয়াটস। আমি জানিলাম না আমাদের অপরাধ!

সিরাজ। তোমাদের অপরাধ, সভ্যতার, শিষ্টাচারের সীমা অতিক্রম করেচে। স্পর্দ্ধা তোমাদের আকাশস্পর্শী হয়ে উঠেচে। শুধু শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় আমি এতদিন তোমাদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করে এসেচি। কিন্তু ভদ্রতার অযোগ্য তোমরা!

ওয়াটস। আপনার অভিযোগ বুঝিতে পারিলাম না!

সিরাজ। মুন্সিজি, অ্যাডমিরাল ওয়াটসনের পত্র!

[*মুন্সিজি একখানি পত্র বাহির করিলেন*]

সিরাজ। এই পত্র সম্বন্ধে তুমি কিছু জান?

[*মুন্সি পত্র ওয়াটসকে দিলেন। ওয়াটস পড়িতে লাগিলেন*]

শেষের দিকে কী লেখা আছে?

ওয়াটস। I now acuaint you, that the remainder of the troops, which should have been here long since (and which I hear the Colonel told you he expected) will beat at Calcutta in a few days; that in a few days more I shall despatch a vessel for more ships and more troops and that I will kindle such a flame in your country as all the water in the Ganges hall not be able to extinguish.

সিরাজ। মুন্সিজি, এই পত্রের মর্ম সভাসদদের বুঝিয়ে দিন।

[*মুন্সি পত্র লইয়া বাংলা তর্জমা শুনাইলেন*]

মুন্সি। কর্নেল ক্লাইভ যে সৈন্যের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহা শীঘ্রই কলিকাতায় পৌঁছিবে। আমি সত্বর আর একখানা জাহাজ মাদ্রাজে পাঠাইয়া সংবাদ দিব যে, আরো সৈন্য এবং আরো জাহাজ বাংলায় আবশ্যক। বাংলায় আমি এমন আগুন জ্বালাইব, যাহা গঙ্গার সমস্ত জল দিয়াও নিভানো যাইবে না।

সিরাজ। ওয়াটস! এ ভীতি প্রদর্শনের অর্থ কী?

ওয়াটস। Admiral এ-কথা লিখিয়াছেন কেন, আমি বুঝি না।

সিরাজ। বুঝিয়ে আমি দিচ্ছি। মুন্সিজি, ওয়াটসের পত্র!

[*মুন্সি পত্রখানা বাহির করিলেন*]

আপনিই পড়ুন, ওর হাতে দেবেন না। আচ্ছা, ওকে একবার দেখিয়ে নিন।

[*ওয়াটস পত্র দেখিল*]

বলতে পার যে, তোমার হাতের লেখা নয়?

ওয়াটস। হাঁ, আমি লিখিয়াছে।

সিরাজ। পড়ুন মুন্সিজি!

মুন্সি। It is impossible to rely upon the Nabob and it will be wise to attack Chandernagore. নবাবের উপর নির্ভর করা অসম্ভব। চন্দননগর আক্রমণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

সিরাজ। তোমাদের অভদ্রতার, ঔদ্ধত্যের আরো পরিচয় চাও? জেনে রাখো, তাও আমি দিতে পারি। আমার সভাসদরা, আমার স্বদেশীয়রা তারস্বরে ঘোষণা করে—আমি নির্বোধ,অত্যাচারী, বিলাস-সর্বস্ব; কিন্তু আমি যে সকলের শয়তানির সন্ধান রাখি, তার সামান্য পরিচয় আজ দিয়ে রাখলাম। তুমি ওয়াটস, তুমি আমারই দরবারে স্থান পেয়ে আমার সভাসদদের আমারই বিরুদ্ধে উত্তেজিত কর, কলকাতায় ইংরেজদের উপদেশ দাও আমারই আদেশ লঙ্ঘন করে কাজ করতে। জান এর শাস্তি কী?

ওয়াটস। Punish me, Your Excellency, if you will. I can only say that I have done my duty.

সিরাজ। এই মুহূর্তে তুমি আমার দরবার ত্যাগ করো। ভবিষ্যতে আর কখনো এ-দরবারে তুমি স্থান পাবে না। তোমার কোম্পানি যদি সদ্ব্যবহার দিয়ে আমাকে আবার খুশি করতে পারে, তা হলো কোম্পানির প্রতিনিধি হিসাবে কোনো সচ্চরিত্র ইংরেজকে আমি দরবারে স্থান দোব, তোমাকে নয়—আর তাও এখন নয়। যাও।

ওয়াটস। Farewell, Your Excellency!

[*নবাবকে কুর্নিশ করিয়া ওয়াটস বাহির হইয়া গেলেন*]

রাজবল্লভ। জাঁহাপনা!

সিরাজ। একটু অপেক্ষা করুন রাজা।—মঁসিয়ে লা!

মঁসিয়ে লা। At your command, Your Excellency.

[*সিংহাসনের সামনে গিয়া কুর্নিশ করিলেন*]

সিরাজ। তোমাদের কাছে আমি লজ্জিত। তোমরা, ফরাসিরা, বহুদিন থেকেই বাংলা দেশে বাণিজ্য করচ। আমার সঙ্গে কখনো তোমরা অসদ্ব্যবহার করনি। ইংরেজদের সঙ্গে তোমাদের বিবাদ আজকাল নয়, আর এ-দেশের কোনো ব্যাপার নিয়েও নয়। সাগরের ওপারে তোমরা পরস্পর পরস্পরের টুঁটি চেপে মারলেও আমার কিছু বলবার থাকে না। আমার রাজ্যে তোমরা শান্ত হয়ে থাক, এই আমার কামনা। ইংরেজরা আমার সম্মতি না নিয়ে চন্দননগর অধিকার করেচে, সমস্ত ফরাসি বাণিজ্য কুঠি তাদের ছেড়ে দেওয়া হোক এই মর্মে দাবি উপস্থিত করেচে। তোমরা প্রতিকারের আশায় আমার কাছে উপস্থিত হয়েচ।

মঁসিয়ে লা। We have always sought for your protection, Your Excellency.

সিরাজ। কলকাতা জয়ে আর পূর্ণিয়ার শওকতজঙ্গের সঙ্গে সংগ্রামে আমার বহু লোকক্ষয় ও অর্থব্যয় হয়েচে। আমার মন্ত্রিমণ্ডলও যুদ্ধের পক্ষপাতী নন। এরূপ অবস্থায়, তোমাদের প্রতি আমার অন্তরের পূর্ণ সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও, আমি তোমাদের জন্যে ইংরেজদের সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হতে পারি না। আমার এই অক্ষমতার জন্যে তোমরা আমাকে ক্ষমা করো।

[*সভা কিছুকাল স্তব্ধ রহিল। মঁসিয়ে-লা মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর ধীরে মাথা তুলিয়া নবাবের দিকে চাহিলেন, ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিলেন:*]

মঁসিয়ে লা। Your Excellency! You refuse us your help, your protection—though with great reluctance. I appreciate your feelings. I understand the predicament you are in, I am sorry for you. And I am sorry for ourselevs. We have no other choice than to leave this land, which we have learnt to love. Allow me, Your Excellency, to warn you that you are in a great danger. On our departure from this land, the smothered flame will burst forth and will destroy you kingdom and people.

[*সিরাজ সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিলেন। মঁসিয়ে-লা'র সামনে দাঁড়াইয়া কহিলেন:*]

সিরাজ। আমার বিপদ সম্বন্ধে আমাকে সচেতন করে তুমি আমার প্রতি তোমার অন্তরের প্রীতিরই পরিচয় দিয়েচ। তোমার কথা আমার চিরদিনই মনে থাকবে। প্রয়োজন হলে আমি তোমাকে স্মরণ করব। তখন যেন আমাকে ভুলো না বন্ধু।

মঁসিয়ে লা। I know we shall never meet.

[*দুইজনেই চুপ করিয়া রহিলেন*]

Farewell, Your Excellency!

[*কুর্নিশ করিয়া চলিয়া গেলেন। সিরাজ তাঁহার পিছু পিছু খানিকটা অগ্রসর হইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর দ্রুত ফিরিয়া রাজা রাজবল্লভের নিকট অগ্রসর হইয়া কহিলেন*]

সিরাজ। আপনি যেন কী বলবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন, রাজা?

রাজবল্লভ। এখন সে কথা নিরর্থক।

[*সিরাজ হাসিয়া বলিলেন*]

সিরাজ। জানেন ত! আমাকে কোনো কথা বলেই লাভ নেই—সর্ব-চিকিৎসার বাইরে আমি!

[*সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হইলেন*]

রাজবল্লভ। ওয়াটস সাহেবকে ওরকম করে বিদায় না দিলেও চলত।

[*সিরাজ ফিরিয়া আসিলেন*]

সিরাজ। ওয়াটস-ক্লাইভ-ওয়াটসন কোম্পানির কথা থাক, ইংরেজ-ফরাসি- পোর্তুগীজ প্রসঙ্গ পরিহার করুন। নিজেদের কথা বলুন রাজা, নিজেদের কথা ভাবুন।

জগৎশেঠ। ভাবা যখন উচিত ছিল, তখন যে কিছুই ভাবেননি জাঁহাপনা!

[*সিরাজ দ্রুত তাহার দিকে ফিরিলেন*]

সিরাজ। সে অপরাধ কি বার বার আমি স্বীকার করিনি! আপনাদের সকল অভিযোগ অবনত মস্তকে আমি গ্রহণ করিচি। কখনো কোনো কটূক্তির প্রতিবাদ করিনি। আপনাদের স্পর্দ্ধা নিয়ে কখনও প্রশ্নও তুলিনি। আপনারা সারা দেশে আমার দুর্নাম রটিয়েচেন, কর্মচারীদের মনে অশ্রদ্ধা এনে দিয়েচেন, আত্মীয়-স্বজনের মন দিয়েচেন বিষিয়ে। আর কত হেয় আমাকে করতে চান আপনারা?

জগৎশেঠ। আপনাকে হেয় প্রতিপন্ন করে আমাদের লাভ?

সিরাজ। স্বার্থসিদ্ধি।

জগৎশেঠ। স্বার্থের সন্ধানে আমরা যদি নিযুক্ত থাকতাম—

সিরাজ। বলুন, তা হলে?

জগৎশেঠ। তা হলে বাংলার সিংহাসনে এতদিনে অন্য নবাব বসতেন।

সিরাজ। এত বড়ো কথা আমার মুখের ওপর বলতে আপনার সাহস হয়।

জগৎশেঠ। আপনার উপদ্রবই আমাদের মনে এই সাহস এনে দিয়েচে।

সিরাজ। আমার উপদ্রব নয় শেঠজি, আমার সহিষ্ণুতাই আপনাদের স্পর্দ্ধা বাড়িয়ে দিয়েছে!

মীরজাফর। জাঁহাপনা মানী-লোকের মানহানি করে আপনি আমাদের সকলেরই অপমান করেচেন।

সিরাজ। সকলে মিলে আপনারাই কি আমার কম অপমান করেচেন!

রাজবল্লভ। আমরা কেউ মিথ্যা কলঙ্ক রটাইনি।

সিরাজ। সত্যাশ্রয়ী রাজা! বলুন, সিংহাসনে আরোহণ করবার পরে, এই এক বছরের মধ্যে, কী অনাচার আমি করিচি? বলুন কটা রাত আমি নিশ্চিন্তে কাটিয়েচি, কটা দিন আপনারা আমাকে বিশ্রামের অবসর দিয়েচেন? বলুন!

রাজবল্লভ। আপনার দৈনন্দিন জীবনযাপন-প্রণালী আমাদের কণ্ঠস্থ থাকবার কথা নয়।

সিরাজ। অথচ কবে, কোথায়, কখন, কোন অনাচার আমি করিচি, তা আপনারা নির্ভুল বলে দিতে পারেন!

রাজবল্লভ। পারি এই জন্যই যে পাপ কখনও চাপা থাকে না!

সিরাজ। পাপ যে চাপা থাকে না, হোসেনকুলী প্রাণ দিয়ে তা বুঝিয়ে দিয়ে গেছে।

[*রাজবল্লভের সম্মুখে গিয়া*]

নিজের জীবন দিয়ে কি আবার তা বুঝতে চান?

[*রাজবল্লভ মাথা নীচু করিলেন*]

শেঠজি, জাফর আলি খাঁ, আপনাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধুর মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখুন!

মীরজাফর। এই তরবারি স্পর্শ করে আমি শপথ করচি জাঁহাপনা, আপনি যদি মানী-লোকের এইরূপ অপমান করেন, তা হলে আপনার স্বপক্ষে কখনো অস্ত্র ধারণ করব না।

মোহনলাল। আজ পর্যন্ত কদিন তা ধারণ করেচেন, সিপাহসালার?

মীরজাফর। পূর্ণিয়ার যুদ্ধে অপদার্থ শওকতকে হত্যা করে বুঝি এই স্পর্দ্ধা তোমার হয়েচে মোহনলাল?

মীরমদন। কোনো যুদ্ধে কৃতিত্ব না দেখিয়েও আমি জিজ্ঞাসা করচি, কলকাতা জয় থেকে শুরু করে পূর্ণিয়া বিজয় পর্যন্ত কবে সিপাহসালার নবাবকে সাহায্য করেচেন?

মীরজাফর। জাঁহাপনা! নীচের এই স্পর্দ্ধা!

মোহনলাল। নীচপদস্থ কর্মচারীদের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের কাজের সমালোচনা করা উচিত নয়, এ-কথা যেমন আপনাদের সব সময়েই মনে থাকে, তেমন এ-কথাও মনে রাখা কি উচিত নয় যে, নবাবের কাজের সমালোচনাও সব সময়ে শোভন নয়?

মীরমদন। এ রাজ্যের সকল প্রধান প্রধান সেনাপতি, আমির ওমরাহ, রইস রাজা, মনে করেচেন, নবাব একেবারে অসহায়; সিংহাসন রক্ষা ত নয়ই—আত্মরক্ষার শক্তিও তাঁর নেই। আমরা নবাবের নিমক বৃথাই খাই না, এ কথা তাঁদের মনে রাখা উচিত।

মীরজাফর। এই সব অর্বচীনকে দিয়েই যখন নবাবের কাজ চলবে, তখন চলুন রাজা রাজবল্লভ, চলুন শেঠজি, চলুন দুর্লভরায়, এই দরবার আমরা ত্যাগ করি। নবাব থাকুন তাঁর কর্মক্ষম, শক্তিমান, পরম বিচক্ষণ মন্ত্রী আর সেনাপতিদের নিয়ে। গোলামহোসেন, মোহনলাল আর মীরমদন যখন রয়েচে, তখন আর ভাবনা কী? চলুন!

[*রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, দুর্ল্লভরায় প্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন*]

সিরাজ। দাঁড়ান!

[*সকলে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন*]

দরবার ত্যাগ করতে হলে নবাবের অনুমতি নিতে হয়, এ কথাও আপনাদের মনে করিয়ে দিতে হবে?

মীরজাফর। দরবার ত্যাগ করতে আমরা বাধ্য হচ্ছি জাঁহাপনা।

সিরাজ। বাধ্য হয়ে দরবার ত্যাগ করতে হবে আপনাদের তখন, যখন আপনাদের বন্দি করা হবে। মুন্সিজি, সিপাহসালারের কাছে ওয়াটস যে পত্র লিখেছিলেন, সেই পত্র।

[*মুন্সিজি পত্র বাছিতে লাগিলেন*]

মীরজাফর। আমার কাছে ওয়াটস পত্র লিখেছিলেন!

সিরাজ। হাঁ, নবাবের সিপাহসালার! খোজা পিদ্রুর মারফৎ ওয়াটস এই পত্রখানি আপনারই উদ্দেশে পাঠিয়েছিল; কিন্তু আপনার দুর্ভাগ্যবশত আমাদের হস্তগত হয়েচে। দেখতে চান?

মীরজাফর। নবাবের অনুগ্রহ।

সিরাজ। সভাসদদের শুনিয়ে দোব?

মীরজাফর। পত্রের বিষয় ত আমি অবগত নই জাঁহাপনা।

সিরাজ। সবাইকে শুনিয়ে আপনাকে লজ্জা দেবো না। কেন না আপনি আমার সিপাহসালার। পত্রখানা আপনাকে দেখতেও দোব না, কেন না তা হলে যে উদ্দেশ্যে এই পত্র প্রেরিত হয়েছিল, তাই সিদ্ধ হবে।

মীরজাফর। জাঁহাপনা তা হলে কী করবেন স্থির করেচেন?

সিরাজ। রাজদ্রোহে লিপ্ত প্রজা সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা করা উচিত বিবেচনা করেন?

[*মীরজাফর কোন কথা কহিলেন না*]

রাজা রাজবল্লভ কী বলেন?

রাজবল্লভ। আমারও কোনো গোপন-লিপি কি জাঁহাপনা আবিষ্কার করেচেন?

সিরাজ। রাজা রাজবল্লভকে আমরা চিনি। তিনি কাঁচা কাজ করেন না। জাফর আলি খাঁ!

মীরজাফর। নবাব কি প্রকাশ্য দরবারেই আমার বিচার করতে চান?

[*নবাব তাঁহার দিকে চাহিলেন। তিনি সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিলেন*]

সিরাজ। জাফর আলি খাঁ! আজ বিচারের দিন নয়, সৌহার্দ্য স্থাপনের দিন! অন্যায় আমিও করেচি, আপনারাও করেচেন। খোদাতালার কাছে কে বেশি অপরাধী তা তিনিই বিচার করবেন। আজ আপনাদের কাছে এই ভিক্ষা যে, আমাকে শুধু এই আশ্বাস দিন যে, বাংলার এই দুর্দিনে আমাকে ত্যাগ করবেন না।

রাজবল্লভ। এই দুর্দিনের জন্য কে দায়ী জনাব?

সিরাজ। আবারও বিচার রাজা!

রাজবল্লভ। বিচার নয় জাঁহাপনা। আমি বলতে চাই যে, এখনও সময় আছে। এখনও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে আপোষে নিষ্পত্তি সম্ভবপর।

সিরাজ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে আপোষ! রাজা, ওয়াটসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেও কি আপনারা তাদের মনোভাব বুঝতে পারেননি? কলকাতায় সৈন্যসমাবেশ, চন্দননগর আক্রমণ, কাশিমবাজার অভিমুখে অভিযান, সবই কি শান্তি স্থাপনের প্রয়াস?

জগৎশেঠ। নবাব যদি কলকাতা আক্রমণ না করতেন, তা হলে এসব কিছুই আজ হতো না।

সিরাজ। কলকাতার দুর্গকে তারা যদি দুর্ভেদ্য করে তুলতে না চাইত, তা হলে আমাকেও কলকাতা আক্রমণ করতে হতো না! বাংলাদেশ অরাজক ছিল না। কোম্পানির দুর্গ প্রতিষ্ঠার কী প্রয়োজন ছিল বলতে পারেন?

মীরজাফর। আপনি আমাদের কী করতে বলেন জাঁহাপনা!

সিরাজ। সবার আগে বলি—বাংলার মান, বাংলার মর্যাদা, বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়াসে আপনারা আপনাদের শক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, সর্বরকমে আমাকে সাহায্য করুন। আপনাদের সকলের সমবেত চেষ্টার ফলে যদি এই বিপদ থেকে আমরা পরিত্রাণ পাই, তা হলে একদিন আপনারা আমার বিচারে বসবেন। সেদিন যে দণ্ড আপনারা দেবেন, আমি মাথা পেতে নোব। আমাকে অযোগ্য মনে করে আর কাউকে যদি এই সিংহাসনে বসাতে চান, আমি হৃষ্টমনে সিংহাসনে ছেড়ে দোব।

[*সকলে নীরব রহিলেন*]

জাফর আলি খাঁ, আপনি শুধু সিপাহসালার নন, আপনি আমার পরম আত্মীয়। বিপদে আপন-জন জেনে বুকে ভরসা নিয়ে যার কাছে দাঁড়ানো যায় সেই না আত্মীয়। লোভে পড়ে, অথবা মোহের বশে, মানুষ অনেক সময় অনেক অন্যায় কাজে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু কর্তব্যের আহ্বানে লোভ মোহ জয় করে যে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পাবে, সেই ত পুরুষ। সে পৌরুষ আপনার আছে, আমি জানি।

[*একটু চুপ করিয়া সকলের মুখভাব লক্ষ করিয়া দেখিলেন। তারপর আবার বলিতে লাগিলেন*]

রাজা রাজবল্লভ, ভাগ্যবান জগৎশেঠ, শক্তিমান রায়দুর্ল্লভ, বাংলা শুধু হিন্দুর নয়, বাংলা শুধু মুসলমানের নয়---মিলিত হিন্দু-মুসলমানের মাতৃভূমি গুলবাগ এই বাংলা। অপরাধ আমি যা করিচি, তা মিলিত হিন্দু-মুসলমানের কাছেই করিচি—আঘাত যা পেয়েচি তাও মিলিত হিন্দু-মুসলমানের কাছ থেকেই পেয়েচি। পক্ষপাতিত্বের অপরাধে কেউ আমরা অপরাধী নই। সুতরাং আমি মুসলমান বলে আমার প্রতি আপনারা বিরূপ হবেন না।

[*আবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। আবার বলিলেন:*]

বাংলার ভাগ্যাকাশে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা, তার শ্যামল প্রান্তরে আজ রক্তের আলপনা, জাতির সৌভাগ্য-সূর্য

আজ অস্তাচলগামী; শুধু সুপ্ত সন্তান-শিয়রে রুদ্যমানা জননী নিশাবসানের অপেক্ষায় প্রহর গণনায় রত। কে তাঁকে আশা দেবে? কে তাঁকে ভরসা দেবে? কে শোনবে জীবন দিয়েও রোধ করব মরণের অভিযান?

মীরজাফর। জাঁহাপনা, জনাব!

সিরাজ। আপনি! হাঁ আপনি সিপাহসালার, আপনিই তা পারেন।

মীরজাফর। আমি শপথ করচি জাঁহাপনা, আজ থেকে সর্বসময়ে সর্বক্ষেত্রে, আপনার সহায়তা করব।

মোহনলাল। আমিও শপথ করচি সিপাহসালারের সকল নির্দেশ মাথা পেতে নোব।

মীরমদন। তাঁর আদেশে হাসিমুখেই মৃত্যুকে বরণ করব।

সিরাজ। আমি আজ ধন্য! আমি ধন্য!

গোলামহোসেন। জনাব, পলাশির কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে বলেছিলেন।

সিরাজ। হাঁ, পলাশি! সিপাহসালার, পলাশি-প্রান্তরে আমাদের সৈন্য সমাবেশ করতে হবে। ক্লাইভের নেতৃত্বে কোম্পানির ফৌজ সেই পথেই এগিয়ে আসছে। আপনার আদেশ পালন করবার জন্য রায়দুর্লভ, ইয়ারলতিফ, মোহনলাল, মীরমদন, সিনফ্রে, সবাই নিজ নিজ সৈন্যবাহিনী নিয়ে সেখানে উপস্থিত থাকবেন। আমিও আপনার আদেশবহ হয়ে থাকব। আপনাদের আর আমি দরবারে আবদ্ধ রাখব না। আপনারা পলাশি যাত্রার আয়োজন করুন!

[*প্রথমে সৈন্যাধ্যক্ষগণ এবং পরে সভাসদগণ দরবার ত্যাগ করিলেন। রহিলেন শুধু সিরাজ আর গোলামহোসেন। সিরাজ চারিদিকে চাহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হইলেন, সামনে নুইয়া পড়িয়া সিংহাসনের দিকে চাহিয়া রহিলেন, ঘাড় ঘুরাইয়া অস্ফুট কণ্ঠে ডাকিলেন*]

সিরাজ। গোলামহোসেন!

গোলামহোসেন। জাঁহাপনা!

সিরাজ। সিংহাসন কি টলছে?

গোলামহোসেন। না, জাঁহাপনা।

সিরাজ। ভালো করে দ্যাখ ত।

[*দুইজনেই সিংহাসন দেখিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে ঘসেটিবেগম প্রবেশ করিলেন, দাঁড়াইয়া দেখিলেন। তারপর কহিলেন:*]

ঘসেটি। ওখানে কী দেখচ মূর্খ, বিবেকের দিকে চেয়ে দ্যাখো!

সিরাজ। কে!

[*দ্রুত ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া ঘসেটিকে দেখিলেন। হাসিয়া কহিলেন*]

ও আপনি!

[*কাছে অগ্রসর হইলেন*]

কাজ আছে? তা স্মরণ করলেই ত দেখা করতাম।

ঘসেটি। নবাবের অবসরের বড়োই অভাব, না?

সিরাজ। বিপদ এমনি ঘনিয়ে আসচে যে, একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়িচি।

ঘসেটি। এখনও বিপদ? ঘসেটি বেগম তোমার বন্দি, শওকতজঙ্গ রণক্ষেত্রে নিহত, প্রতিদ্বন্দ্বী আর কোথাও নেই, এখনও বিপদের ভয়!

সিরাজ। কোম্পানির ফৌজ কাশিমবাজার অভিমুখে অভিযান করেচে।

ঘসেটি। করেচে!

সিরাজ। সেই সংবাদই পেয়েচি!

ঘসেটি। তা হলে মুর্শিদাবাদেও তারা আসবে?

সিরাজ। তেমনি দুর্দিন কে কামনা করে মা!

ঘসেটি। দুর্দিন না সুদিন?

সিরাজ। সুদিন!

ঘসেটি। সুদিন নয়? ঘসেটির বন্ধন মোচন হবে, সিরাজের পতন হবে, সুদিন নয়?

সিরাজ। আপনি বুঝতে পারচেন না, আপনি কী বলচেন!

ঘসেটি। বেশ বুঝতে পারচি। অন্তরে যে কথা দিন-রাত গুমরে গুমরে মরচে, তাই আজ ভাষায় প্রকাশ করচি। মাসিকে তুমি গৃহ-হারা করেচ, মাসির সর্ব্বস্ব লুটে নিয়েচ, মাসিকে দাসী করে রেখেচ। মাসি তা ভুলবে?

সিরাজ। অকারণে অভাগাকে আর তিরস্কার করবেন না।

ঘসেটি। অকারণে!

সিরাজ। নয় কি?

ঘসেটি। মতিঝিল কে অধিকার করেচে? আমার সঞ্চিত সম্পদ কে হস্তগত করেচে? কে আমার পালিত পুত্রকে সিংহাসন থেকে দূরে রেখেচ? তুমি নও, দস্যু?

সিরাজ। মতিঝিল আপনারই রয়েচে মা।

ঘসেটি। তা হলে সেখানে যাবার অধিকার কেন আমার নেই?

সিরাজ। রাজনীতির কারণে।

ঘসেটি। তোমার রাজনীতির সঙ্গে আমার সম্বন্ধ? আমার রাজ্য নাই, তাই আমার কাছে রাজনীতিও নাই—আছে শুধু প্রতিহিংসা। এই প্রতিহিংসা আমার পূর্ণ হবে সেইদিন—যেদিন তোমার এই প্রাসাদ অপরে অধিকার করবে, তোমাকে ঐ সিংহাসন থেকে ঠেলে ফেলে শওকতজঙ্গের মতো কেউ যেদিন তোমাকে...

[লুৎফা ছুটিয়া আসিল]

লুৎফা। মা, মা, তোমার মুখের ও-কথা শেষ কোরো না মা।

ঘসেটি। নবাব-মহিষী!

লুৎফা। নবাব-মহিষী নই মা, তোমার কন্যা।

ঘসেটি। নবাব-মহিষী নও? আজ ভাবচ খুবই বিনয় করলে, কিন্তু দুদিন বাদে ওই কথাই সত্য হবে। এই আমার মতো জীবন যাপন করতে হবে!

লুৎফা। নবাব!

ঘসেটি। নবাব-মহিষী এই বাঁদির বিরুদ্ধে অভিযোগ করচেন নবাব। বাঁদিকে দণ্ড দিয়ে মহিষীকে খুশি করুন!

লুৎফা। জাঁহাপনা, ওকে ওঁর প্রাসাদে ফিরে যেতে দিন।

সিরাজ। দোব লুৎফা—সময় এলেই পাঠিয়ে দোব।

ঘসেটি। এখনো আশা—সময় আসবে?

লুৎফা। অমন করে ওকথা বলো না মা। বুক আমার কেঁপে ওঠে।

ঘসেটি। তোমার বুক কেঁপে ওঠে। আর আমার বুক যে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে, তা কি তোমরা বুঝেচ, না কখনো বুঝতে চেয়েচ? অনাথা বিধবা আমি, নিজের গৃহে দুঃখকে সাথি করে পড়েছিলাম, অত্যাচারের প্রতিকারে অক্ষম হয়ে ডুকরে কেঁদে সান্ত্বনা পেতাম। তোমরা তাতেও বাদ সাধলে, ছল করে ধরে এনে পাপ-পুরীতে বন্দিনী করে রাখলে। তোমাদের আমি ক্ষমা করব!

সিরাজ। আর আমরাই বুঝি ক্ষমা করব বিদ্রোহিনীকে। মায়ের মতো সম্মান দিয়ে মায়ের বোনকে মায়ের পাশেই বসিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম। তোমার তা ভালো লাগচে না! আজ ভয় হচ্ছে শেষটায় না বাধ্য হয়ে তোমাকে বন্দিনীর মতোই কারাগারে স্থান দিতে হয়।

লুৎফা। নবাব! জাঁহাপনা।

সিরাজ। ঘরে-বাইরে প্রতিনিয়ত এই বাক্যজ্বালা আমি আর সইতে পারি না লুৎফা! এমন কোনো অপরাধ আমি করিনি, যার জন্যে সকলের কাছে সব সময়ে অপরাধীর মতো আমাকে করজোড়ে থাকতে হবে।

[*দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিলেন*]

ঘসেটি। অপরকে বঞ্চিত করে যে সিংহাসন পেয়েচ, সে সিংহাসন তোমাকে শান্তি দেবে ভেবেচ?

সিরাজ। আমি জানি কেমন করে ওদের কণ্ঠ রোধ করা যায়, কেমন করে স্পর্দ্ধায় উন্নত ওদের শির আমার পায়ের তলায় নুইয়ে দেওয়া যায়। শুধু আমার মুখের একটি কথা, চোখের একটি ইঙ্গিত সাপেক্ষ। আমি তাও পারি না। পারি না শুধু আমি কঠোর নই বলে, পারি না শুধু পরের ব্যথায় আমার প্রাণ কেঁদে ওঠে বলে।

[*ক্ষোভে দুঃখে সিরাজ প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। লুৎফা তাঁহার কাছে গিয়া কহিলেন*]

লুৎফা। নবাব, জাঁহাপনা, আপনার চোখে জল? আমি যে সইতে পারি না।

ঘসেটি। আজকার এ কান্না শুধুই বিলাস; কিন্তু এ কান্নায় বিরাম নেই। চোখের জলে নবাব পথ দেখতে পাবেন না। বেগমকে আজীবন আমারই মতো কেঁদে কাটাতে হবে। আমিনা কেঁদে কেঁদে অন্ধ হবে! পলাশি-প্রান্তরে কোলাহল ছাপিয়ে উঠবে ক্রন্দন-রোল! সিরাজের নবাবির এই পরিণাম!

[*ঘসেটি চলিয়া গেলেন। নবাব তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, লুৎফা তাঁহাকে ধরিলেন*]

সিরাজ। বলতে পার লুৎফা, বলতে পার, ওই ঘসেটি বেগম মানবী না দানবী?

লুৎফা। ওকে ওর প্রাসাদে পাঠিয়ে দিন জাঁহাপনা। ওর সঙ্গে থাকতে আমার ভয় হয়। মনে হয়, ওর নিশ্বাসে বিষ, ওর দৃষ্টিতে আগুন, ওর অঙ্গ-সঞ্চালনে ভূমিকম্প!

সিরাজ। মাত্র পনেরোটি মাস আমি রাজত্ব করচি, লুৎফা! এই পনেরো মাসে আমার এমনি অভিজ্ঞতা হয়েছে, মানুষেরা এমনি নির্মমতার পরিচয় আমি পেয়েচি যে, কোনো মানুষকে শ্রদ্ধাও করতে পারি না, ভালোও বাসতে পারি না।

লুৎফা। চলুন জাঁহাপনা, একটু বিশ্রাম করবেন।

সিরাজ। বিশ্রাম! বিশ্রামের অবসর হবে পলাশির পর।

লুৎফা। পলাশি! সে কি জাঁহাপনা?

সিরাজ। তুমি এখনও শোনোনি? পলাশির মাঠে আবার যুদ্ধের সম্ভাবনা।

লুৎফা। আবার যুদ্ধ! জাঁহাপনা?

সিরাজ। পনেরো মাসের নবাবি লুৎফা, তার মাঝে পুরো একটি বছর যুদ্ধে, ষড়যন্ত্রভেদে, গুপ্তচর পরিচালনায় অতিবাহিত হয়েচে। এইবার হয় ত শেষ যুদ্ধ!

লুৎফা। শেষ যুদ্ধ!

সিরাজ। যদি জয়ী হই, তা হলে হয়তো আর যুদ্ধ হবে না—আর যদি পরাজিত হই, তা হলে তো নয়ই!

লুৎফা । পলাশি!

সিরাজ। পলাশি! লাখে লাখে পলাশ-ফুলের অগ্নি-বরণে কোনোদিন হয়তো পলাশির প্রান্তর রাঙা হয়ে থাকত, তাই আজও তার বুকে রক্তের তৃষা। জানি না, আজ কার রক্ত সে চায়। পলাশি, রাক্ষসী পলাশি!

[*নবাব বাহির হইয়া গেলেন। মঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল। করুণ সুরে বাদ্য বাজিল। যবনিকা পড়িল*]

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৯২—১৯৬১) : জন্ম অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত খুলনায়। বিখ্যাত নাট্যকার। ছাত্রাবস্থাতেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। শিক্ষক সখারাম গণেশ দেউস্করের কাছে সাংবাদিকতার পাঠ নেন। তিনি 'হিতবাদী' পত্রিকায় সখারামের সহযোগী ছিলেন। পরে 'বৈকালী', 'বিজলী', 'আত্মশক্তি' প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। সহ-সম্পাদক হিসেবে 'দৈনিক কৃষক' ও 'ভারত' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩০ থেকে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি তাঁর কালজয়ী নাটকগুলি লিখেছিলেন। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য নাটকগুলির মধ্যে রয়েছে— 'সিরাজদ্দৌলা', 'গৈরিক পতাকা', 'রক্তকমল', 'সংগ্রাম ও শান্তি', 'ধাত্রী পান্না', 'এই স্বাধীনতা', 'সবার উপরে মানুষ সত্য', 'রাষ্ট্রবিপ্লব' প্রভৃতি। তাঁর নাটকের প্রধান গুণ স্বাদেশিকতা এবং জাতীয়তাবোধ। তিনি শুধু নাটক রচনাতেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না, নাট্যমঞ্চের সঙ্গেও তাঁর নিবিড় সম্পর্ক ছিল।

প্রলয়োল্লাস

কাজী নজরুল ইসলাম

তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
ওই নূতনের কেতন ওড়ে কালবোশেখির ঝড়।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
আসছে এবার অনাগত প্রলয়-নেশার নৃত্য পাগল,
সিন্ধুপারের সিংহদ্বারে ধমক হেনে ভাঙল আগল!
মৃত্যু-গহন অন্ধকূপে
মহাকালের চণ্ড-রূপে —
ধূম্র-ধূপে
বজ্রশিখার মশাল জ্বেলে আসছে ভয়ংকর!

ওরে ওই হাসছে ভয়ংকর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
ঝামর তাহার কেশের দোলায় ঝাপটা মেরে গগন দুলায়,
সর্বনাশী জ্বালামুখী ধূমকেতু তার চামর ঢুলায়!
বিশ্বপাতার বক্ষ-কোলে
রক্ত তাহার কৃপাণ ঝোলে
দোদুল দোলে!
অট্টরোলের হট্টগোলে স্তব্ধ চরাচর —
ওরে ওই স্তব্ধ চরাচর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!!
দ্বাদশ রবির বহ্নিজ্বালা ভয়াল তাহার নয়নকটায়,
দিগন্তরের কাঁদন লুটায় পিঙ্গল তার ত্রস্ত জটায়!
বিন্দু তাহার নয়নজলে
সপ্ত মহাসিন্ধু দোলে
কপোলতলে !
বিশ্বমায়ের আসন তারই বিপুল বাহুর পর —
হাঁকে ওই 'জয় প্রলয়ঙ্কর !'
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !!
মাভৈঃ মাভৈঃ ! জগৎ জুড়ে প্রলয় এবার ঘনিয়ে আসে
জরায়-মরা মুমূর্ষুদের প্রাণ-লুকানো ওই বিনাশে !
এবার মহানিশার শেষে
আসবে ঊষা অরুণ হেসে
করুণ বেশে !
দিগম্বরের জটায় হাসে শিশু-চাঁদের কর —
আলো তার ভরবে এবার ঘর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !!

ওই সে মহাকাল-সারথি রক্ত-তড়িৎ চাবুক হানে,
রণিয়ে ওঠে হ্রেষার কাঁদন বজ্রগানে ঝড়-তুফানে !
ক্ষুরের দাপট তারায় লেগে উল্কা ছুটায় নীল খিলানে !
গগনতলের নীল খিলানে !
অন্ধ কারার বন্ধ কূপে
দেবতা বাঁধা যজ্ঞ-যূপে
পাষাণ-স্তূপে !
এই তো রে তার আসার সময় ওই রথঘর্ঘর —

শোনা যায় ওই রথঘর্ঘর !

তোরা সব জয়ধ্বনি কর !

তোরা সব জয়ধ্বনি কর!!

ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর? — প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন !
আসছে নবীন — জীবনহারা অ-সুন্দরে করতে ছেদন !
তাই সে এমন কেশে বেশে
প্রলয় বয়েও আসছে হেসে —
মধুর হেসে।

ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চিরসুন্দর !

তোরা সব জয়ধ্বনি কর !

তোরা সব জয়ধ্বনি কর !!

ওই ভাঙা-গড়া খেলা যে তার কিসের তবে ডর ?
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !
বধূরা প্রদীপ তুলে ধর।
কাল-ভয়ংকরের বেশে এবার ওই আসে সুন্দর ! —

তোরা সব জয়ধ্বনি কর !

তোরা সব জয়ধ্বনি কর !!

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯—১৯৭৬) : বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্ম। ১৩২৬ বঙ্গাব্দে তাঁর প্রথম কবিতা 'মুক্তি' প্রকাশিত হয়। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে 'বিজলী' পত্রিকায় 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশিত হলে সমগ্র বাংলায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়। 'বিদ্রোহী' কবি নজরুলের প্রতিবাদের হাতিয়ার ছিল তাঁর গান ও কবিতা। কবি তাঁর লেখায় কেবল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নয়, সমস্ত অন্যায় অবিচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। নজরুলের কবিতা ও গান চিরকাল বাঙালিকে উদ্দীপিত করে। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে— 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশি', 'সাম্যবাদী', 'সর্বহারা', 'ফণীমনসা', 'প্রলয়শিখা', 'ছায়ানট', 'চক্রবাক' প্রভৃতি।

পথের দাবী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পুলিশ-স্টেশনে প্রবেশ করিয়া দেখা গেল, সুমুখের হলঘরে জন-ছয়েক বাঙালি মোট-ঘাট লইয়া বসিয়া আছে, জগদীশবাবু ইতিমধ্যেই তাহাদের টিনের তোরঙ্গ ও ছোটো-বড়ো পুঁটলি খুলিয়া তদারক শুরু করিয়া দিয়াছেন। শুধু যে লোকটির প্রতি তাঁহার অত্যন্ত সন্দেহ হইয়াছে তাহাকে আর একটা ঘরে আটকাইয়া রাখা হইয়াছে। ইহারা সকলেই উত্তর-ব্রহ্মে বর্মা-অয়েল-কোম্পানির তেলের খনির কারখানায় মিস্ত্রির কাজ করিতেছিল, সেখানের জলহাওয়া সহ্য না হওয়ায় চাকরির উদ্দেশে রেঙ্গুনে চলিয়া আসিয়াছে। ইহাদের নাম ধাম ও বিবরণ লইয়া ও সঙ্গের জিনিসপত্রের পরীক্ষা করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইলে, পোলিটিক্যাল সাসপেক্ট সব্যসাচী মল্লিককে নিমাইবাবুর সম্মুখে হাজির করা হইল। লোকটি কাশিতে কাশিতে আসিল। অত্যন্ত ফরসা রং রৌদ্রে পুড়িয়া যেন তামাটে হইয়াছে। বয়স ত্রিশ-বত্রিশের অধিক নয়, কিন্তু ভারী রোগা দেখাইল। এইটুকু কাশির পরিশ্রমেই সে হাঁপাইতে লাগিল। সহসা আশঙ্কা হয়, সংসারের মিয়াদ বোধ করি বেশি দিন নাই; ভিতরের কী একটা দুরারোগ্য রোগে সমস্ত দেহটা যেন দ্রুতবেগে ক্ষয়ের দিকে ছুটিয়াছে। কেবল আশ্চর্য সেই রোগা মুখের অদ্ভুত দুটি চোখের দৃষ্টি। সে চোখ ছোটো কি বড়ো, টানা কি গোল, দীপ্ত কি প্রভাহীন এ-সকল বিবরণ দিতে যাওয়াই বৃথা—অত্যন্ত গভীর জলাশয়ের মতো কী যে তাহাতে আছে, ভয় হয় এখানে খেলা চলিবে না, সাবধানে দূরে দাঁড়ানোই প্রয়োজন। ইহারই কোন অতল তলে তাহার ক্ষীণ প্রাণশক্তিটুকু লুকানো আছে, মৃত্যুও সেখানে প্রবেশ করিতে সাহস করে না। —কেবল এই জন্যই যেন সে আজও বাঁচিয়া আছে। অপূর্ব মুগ্ধ হইয়া সেইদিকে চাহিয়া ছিল, সহসা নিমাইবাবু তাহার বেশভূষার বাহার ও পারিপাট্যের প্রতি অপূর্বর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া সহাস্যে কহিলেন, বাবুটির স্বাস্থ্য গেছে, কিন্তু শখ ষোলোআনাই বজায় আছে তা স্বীকার করতে হবে। কী বল অপূর্ব?

এতক্ষণে অপূর্ব তাহার পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মুখ ফিরাইয়া হাসি গোপন করিল। তাহার মাথার সম্মুখদিকে বড়ো বড়ো চুল, কিন্তু ঘাড় ও কানের দিকে নাই বলিলেই চলে,—এমনি ছোটো করিয়া ছাঁটা। মাথায় চেরা সিঁথি, —অপর্যাপ্ত তৈলনিষিক্ত, কঠিন, রুগ্ন, কেশ হইতে নিদারুণ নেবুর তেলের গন্ধে ঘর ভরিয়া উঠিয়াছে। গায়ে জাপানি সিল্কের রামধনু রঙের চুড়িদার পাঞ্জাবি, তাহার বুক-পকেট হইতে বাঘ-আঁকা একটা রুমালের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে, উত্তরীয়ের কোনো বালাই নাই। পরনে বিলাতি মিলের কালো মকমল পাড়ের সূক্ষ্ম শাড়ি, পায়ে সবুজ রঙের ফুল মোজা— হাঁটুর উপরে লাল ফিতা দিয়া বাঁধা, বার্নিশ-করা পাম্প শু, তলাটা মজবুত ও টিকসই করিতে আগাগোড়া লোহার নাল বাঁধানো, হাতে একগাছি হরিণের শিঙের হাতল দেওয়া বেতের ছড়ি, —কয়দিনের জাহাজের ধকলে সমস্তই নোংরা হইয়া উঠিয়াছে, —ইহার আপাদমস্তক অপূর্ব বারবার নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, কাকাবাবু, এ লোকটিকে আপনি কোনো কথা জিজ্ঞেস না করেই ছেড়ে দিন, যাকে খুঁজছেন সে যে এ নয়, তার আমি জামিন হতে পারি।

নিমাইবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। অপূর্ব কহিল, আর যাই হোক, যাঁকে খুঁজছেন তাঁর কালচরের কথাটা একবার ভেবে দেখুন।

নিমাইবাবু হাসিয়া ঘাড় নাড়িলেন, কহিলেন, তোমার নাম কী হে?

আজ্ঞে, গিরীশ মহাপাত্র।

একদম মহাপাত্র! তুমিও তেলের খনিতেই কাজ করছিলে, না? এখন রেঙ্গুনেই থাকবে? তোমার বাক্স বিছানা তো খানাতল্লাশি হয়ে গেছে, দেখি তোমার ট্যাঁকে এবং পকেটে কী আছে?

তাহার ট্যাঁক হইতে একটি টাকা ও গণ্ডা-ছয়েক পয়সা বাহির হইল, পকেট হইতে একটা লোহার কম্পাস, মাপ করিবার কাঠের একটা ফুটরুল, কয়েকটা বিড়ি, একটা দেশলাই ও একটা গাঁজার কলিকা বাহির হইয়া পড়িল।

নিমাইবাবু কহিলেন, তুমি গাঁজা খাও?

লোকটি অসঙ্কোচে জবাব দিল, আজ্ঞে না।

তবে এ বস্তুটি পকেটে কেন?

আজ্ঞে, পথে কুড়িয়ে পেলাম, যদি কারও কাজে লাগে তাই তুলে রেখেচি।

জগদীশবাবু এই সময়ে ঘরে ঢুকিতে নিমাইবাবু হাসিয়া কহিলেন, দেখো জগদীশ, কীরূপ সদাশয় ব্যক্তি ইনি। যদি কারও কাজে লাগে তাই গাঁজার কল্‌কেটি কুড়িয়ে পকেটে রেখেছেন। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন, গাঁজা খাবার সমস্ত লক্ষণই তোমাতে বিদ্যমান বাবা, বললেই পারতে, খাই। কিন্তু ক'দিনই বা বাঁচবে, —এই তো তোমার দেহ,—আর খেয়ো না। বুড়োমানুষের কথাটা শুনো।

মহাপাত্র মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া বলিল, আজ্ঞে না মাইরি খাইনে। তবে ইয়ার বন্ধু কেউ তৈরি করে দিতে বললে দিই, —এই মাত্র! নইলে নিজে খাইনে।

জগদীশবাবু চটিয়া উঠিয়া কহিলেন, দয়ার সাগর! পরকে সেজে দি, নিজে খাইনে। মিথ্যেবাদী কোথাকার!

অপূর্ব কহিল, বেলা হয়ে গেল, আমি এখন তবে চললুম কাকাবাবু।

নিমাইবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পারো মহাপাত্র। কী বল জগদীশ, পারে তো? জগদীশ সম্মতি জানাইলে কহিলেন, কিন্তু নিশ্চয় কিছুই বলা যায় না ভায়া, আমার মনে হয় এ শহরে আরও কিছুদিন নজর রাখা দরকার। রাত্রের মেল ট্রেনটার প্রতি একটু দৃষ্টি রেখো, সে যে বর্মায় এসেছে এ খবর সত্য।

জগদীশ কহিলেন, তা হতে পারে, কিন্তু এই জানোয়ারটাকে ওয়াচ করবার দরকার নেই বড়োবাবু। নেবুর তেলের গন্ধে ব্যাটা থানাসুদ্ধ লোকের মাথা ধরিয়ে দিলে! বড়োবাবু হাসিতে লাগিলেন। অপূর্ব পুলিশ-স্টেশন হইতে বাহির হইয়া আসিল, এবং প্রায় তাহার সঙ্গে সঙ্গেই মহাপাত্র তাঁহার ভাঙা টিনের তোরঙ্গ ও চাটাই-জড়ানো ময়লা বিছানার বান্ডিল বগলে চাপিয়া ধীর মন্থরপদে উত্তর দিকের রাস্তা ধরিয়া সোজা প্রস্থান করিল।

আশ্চর্য এই যে, এত বড়ো সব্যসাচী ধরা পড়িল না, কোনো দুর্ঘটনা ঘটিল না এমন সৌভাগ্যকেও অপূর্বর মন যেন গ্রাহ্যই করিল না। বাসায় ফিরিয়া দাড়ি-গোঁফ কামানো হইতে শুরু করিয়া সন্ধ্যাহ্নিক, স্নানাহার, পোশাক-পরা, আফিস যাওয়া প্রভৃতি নিত্য কাজগুলায় বাধা পাইল না সত্য, কিন্তু ঠিক কী যে সে ভাবিতে লাগিল তাহার নির্দেশ নাই, অথচ চোখ-কান ও বুদ্ধি তাহার সাংসারিক সকল ব্যাপার হইতেই একেবারে যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া কোন এক অদৃষ্ট অপরিজ্ঞাত রাজবিদ্রোহীর চিন্তাতেই ধ্যানস্থ হইয়া রহিল। এই অত্যন্ত অন্যমনস্কতা তলওয়ারকর লক্ষ করিয়া চিন্তিতমুখে জিজ্ঞাসা করিল, আজ বাড়ি থেকে কোন চিঠি পেয়েছেন নাকি?

কৈ না।

বাড়ির খবর সব ভালো তো?

অপূর্ব কিছু আশ্চর্য হইয়া কহিল, যতদূর জানি সবাই ভালোই তো আছেন।

রামদাস আর কোনো প্রশ্ন করিল না। টিফিনের সময় উভয়ে একত্র বসিয়া জলযোগ করিত। রামদাসের স্ত্রী অপূর্বকে একদিন সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন, যতদিন তাঁহার মা কিংবা বাটীর আর কোনো আত্মীয়া নারী এদেশে আসিয়া বাসার উপযুক্ত ব্যবস্থাদি না করেন ততদিন এই ছোটো বহিনের হাতের তৈরি যৎসামান্য মিষ্টান্ন প্রত্যহ তাঁহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে। অপূর্ব রাজি হইয়াছিল। আফিসের একজন ব্রাহ্মণ পিয়াদা এই-সকল বহিয়া আনিত। আজও সে নিরালা পাশের ঘরটায় ভোজ্যবস্তুগুলি যখন সাজাইয়া দিয়া গেল, তখন আহারে বসিয়া অপূর্ব নিজেই কথা পাড়িল। কাল তাহার ঘরে চুরি হইয়া গেছে; সমস্তই যাইতে পারিত, কেবল উপরের সেই ক্রিশ্চান মেয়েটির কৃপায় টাকাকড়ি ছাড়া আর সমস্ত বাঁচিয়াছে। সে চোর তাড়াইয়া দরজায় নিজের তালা বন্ধ করিয়াছে, আমি বাসায় পৌঁছিলে চাবি খুলিয়া দিয়া অনাহূত আমার ঘরে ঢুকিয়া ছড়ানো জিনিসপত্র গুছাইয়া দিয়াছে, সমস্ত ফর্দ করিয়া কী আছে আর কি গেছে তার এমন নিখুঁত হিসাব করিয়া দিয়াছে যে বোধ হয় তোমার মত পাশ-করা অ্যাকাউন্টেন্টের পক্ষেও বিস্ময়কর। বাস্তবিক, এমন তৎপর, এতবড়ো কার্যকুশলা মেয়ে আর যে কেহ আছে মনে হয় না হে তলওয়ারকর ! তা ছাড়া এত বড়ো বন্ধু !

রামদাস কহিল, তার পর?

অপূর্ব বলিল, তেওয়ারি ঘরে ছিল না, বর্মা নাচ দেখতে ফয়ায় গিয়েছিল, ইত্যবসরে এই ব্যাপার। তার বিশ্বাস এ কাজ ও ছাড়া আর কেউ করেনি। আমারও অনুমান কতকটা তাই। চুরি না করুক, সাহায্য করেচে।

তার পর?

তারপর সকালে গেলাম পুলিশে খবর দিতে। কিন্তু পুলিশের দল এমন কাণ্ড করলে, এমন তামাশা দেখালে যে ও-কথা আর মনেই হলো না। এখন ভাবচি, যা গেছে তা যাক, তাদের চোর ধরে দিয়ে আর কাজ নেই, তারা বরঞ্চ এমনিধারা বিদ্রোহী ধরে ধরেই বেড়াক। এই বলিয়া তাহার গিরীশ মহাপাত্র ও তাহার পোশাক-পরিচ্ছদের বাহার মনে পড়িয়া হঠাৎ হাসির ছটায় যেন দম আটকাইবার উপক্রম হইল। হাসি থামিলে সে বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শী বিলাতের ডাক্তার উপাধিধারী রাজশত্রু মহাপাত্রের স্বাস্থ্য, তাহার শিক্ষা ও রুচি, তাহার বল-বীর্য, তাহার রামধনু রঙের জামা, সবুজ রঙের মোজা ও লোহার নালঠোকা পাম্প শু, তাহার নেবুর তেলের গন্ধবিলাস, সর্বোপরি তাহার পরহিতায় গাঁজার কলিকাটির আবিষ্কারের ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণনা করিতে করিতে তাহার উৎকট হাসির বেগ কোনোমতে আর একবার সংবরণ করিয়া শেষে কহিল, তলওয়ারকর, মহা হুঁশিয়ার পুলিশের দলকে আজকের মতো নির্বোধ আহম্মক হতে বোধ করি কেউ কখনো দেখেনি। অথচ, গভর্নমেন্টের কত টাকাই না এরা বুনো হাঁসের পিছনে ছুটোছুটি করে অপব্যয় করলে!

রামদাস হাসিয়া কহিল, কিন্তু বুনো হাঁস ধরাই যে এদের কাজ; আপনার চোর ধরে দেবার জন্যে এরা নেই। আচ্ছা, এরা কি আপনাদের বাংলা দেশের পুলিশ?

অপূর্ব কহিল, হাঁ। তা ছাড়া আমার বড়ো লজ্জা এই যে এদের যিনি কর্তা তিনি আমার আত্মীয়, আমার পিতার বন্ধু। বাবাই একদিন এঁর চাকরি করে দিয়েছিলেন।

রামদাস কহিল, তাহলে আপনাকেই হয়তো আর একদিন তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কিন্তু কথাটা বলিয়া ফেলিয়া সে-ই একটু অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিল,—আত্মীয়ের সম্বন্ধে এরূপ একটা মন্তব্য প্রকাশ করা হয়তো শোভন হয় নাই। অপূর্ব তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া অর্থ বুঝিল, কিন্তু এই ধারণা যে সত্য নয়, ইহাই সতেজে ব্যক্ত করিতে সে জোর করিয়া বলিল, আমি তাঁকে কাকা বলি, আমাদের তিনি আত্মীয়, শুভাকাঙ্ক্ষী, কিন্তু তাই বলে আমার দেশের চেয়ে তো তিনি আপনার নন। বরঞ্চ, যাঁকে তিনি দেশের টাকায়, দেশের লোক দিয়ে শিকারের মতো তাড়া করে বেড়াচ্ছেন তিনি ঢের বেশি আমার আপনার।

রামদাস মুচকিয়া একটু হাসিয়া কহিল, বাবুজি, এ-সব কথা বলার দুঃখ আছে।

অপূর্ব কহিল, থাকে, তাই নেব। কিন্তু তাই বলে তলওয়ারকর,—শুধু কেবল আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর যে-কোনো দেশে, যে-কোনো যুগে যে-কেউ জন্মভূমিকে তার স্বাধীন করবার চেষ্টা করেচে, তাকে আপনার নয় বলবার সাধ্য আর যার থাক আমার নেই। বলিতে বলিতে কণ্ঠস্বর তাহার তীক্ষ্ণ এবং চোখের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল; মনে মনে বুঝিল কী কথায় কী কথা আসিয়া পড়িতেছে, কিন্তু সামলাইতে পারিল না, বলিল, তোমার মতো সাহস আমার নেই, আমি ভীরু, কিন্তু তাই বলে অবিচারে দণ্ডভোগ করার অপমান আমাকে কম বাজে না রামদাস। বিনা দোষে ফিরিঙ্গি ছোঁড়ারা আমাকে যখন লাথি মেরে প্ল্যাটফর্ম থেকে বার করে দিলে, এবং এই অন্যায়ের প্রতিবাদ যখন করতে গেলাম, তখন সাহেব স্টেশনমাস্টার কেবলমাত্র আমাকে দেশি লোক বলেই দেশের স্টেশন থেকে কুকুরের মতো দুর করে দিলে,—তার লাঞ্ছনা এই কালো চামড়ার নীচে কম জ্বলে না তলওয়ারকর! এমন তো নিত্য-নিয়তই ঘটচে,—আমার মা, আমার ভাই-বোনকে যারা এই-সব সহস্র কোটি অত্যাচার থেকে উদ্ধার করতে চায় তাদের আপনার বলে ডাকবার যে দুঃখই থাক আমি আজ থেকে মাথায় তুলে নিলাম।

রামদাসের সুশ্রী গৌরবর্ণ মুখ ক্ষণকালের জন্য আরক্ত হইয়া উঠিল, বলিল, কৈ এ ঘটনা তো আমাকে বলেন নি?

অপূর্ব কহিল, বলা কি সহজ রামদাস? হিন্দুস্থানের লোক সেখানে কম ছিল না, কিন্তু, আমার অপমান কারও গায়েই ঠেকল না এমনি তাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। লাথির চোটে আমার যে হাড়-পাঁজরা ভেঙে যায়নি এই সুখবরে তারা সব খুশি হয়ে গেল। তোমাকে জানাব কি—মনে হলে দুঃখে লজ্জায় ঘৃণায় নিজেই যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যাই।

রামদাস চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু তাহার দুই চোখ ছলছল করিয়া আসিল। সুমুখের ঘড়িতে তিনটা বাজিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বোধ হয় কী একটা বলিতে গেল, কিন্তু কিছুই না বলিয়া হঠাৎ হাত বাড়াইয়া অপূর্বর ডান হাতটা টানিয়া লইয়া একটা চাপ দিয়া নিঃশব্দে নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

সেই দিন বিকালে আফিসের ছুটি হইবার পূর্বে বড়োসাহেব একখানা লম্বা টেলিগ্রাম হাতে অপূর্বর ঘরে ঢুকিয়া কহিলেন, আমাদের ভামোর আফিসে কোনো শৃঙ্খলাই হচ্চে না। ম্যান্‌ডালে, শোএবো, মিক্‌থিলা এবং এদিকে প্রোম সব-কটা আফিসেই গোলযোগ ঘটচে। আমার ইচ্ছা তুমি একবার সবগুলো দেখে আস। আমার অবর্তমানে সমস্ত ভারই তো তোমার,—একটা পরিচয় থাকা চাই,—সুতরাং বেশি দেরি না করে কাল-পরশু যদি একবার—

অপূর্ব তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া বলিল, আমি কালই বার হয়ে যেতে পারি। বস্তুত, নানা কারণে রেঙ্গুনে তাহার আর একমুহূর্ত মন টিকিতে ছিল না। উপরন্তু, এই সূত্রে দেশটাও একবার দেখা হইবে। অতএব যাওয়াই স্থির হইল, এবং পরদিনই অপরাহ্ণবেলায় সুদূর ভামো নগরের উদ্দেশে যাত্রা করিয়া সে ট্রেনে চাপিয়া বসিল। সঙ্গে রহিল আরদালি এবং আফিসের একজন হিন্দুস্থানি ব্রাহ্মণ পিয়াদা। তেওয়ারি খবরদারির জন্য বাসাতেই রহিল। পা-ভাঙা সাহেব হাসপাতালে পড়িয়া, সুতরাং তেমন আর ভয় নাই। বিশেষত, এই রেঙ্গুন শহরটা বরং সহিয়াছিল, কিন্তু আরও অজানা স্থানে পা বাড়াইবার তাহার প্রবৃত্তিই ছিল না। তলওয়ারকর তেওয়ারির পিঠ ঠুকিয়া দিয়া সাহস দিয়া কহিল, তোমার চিন্তা নেই ঠাকুর, কোনো কিছু হলেই আফিসে গিয়ে আমাকে সংবাদ দিয়ো।

গাড়ি ছাড়িতে বোধ করি তখনও মিনিট-পাঁচেক বিলম্ব ছিল, অপূর্ব হঠাৎ চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, ওই যে।

তলওয়ারকর ঘাড় ফিরাইতেই বুঝিল, এই সেই গিরীশ মহাপাত্র। সেই বাহারে জামা, সেই সবুজ রঙের ফুল মোজা, সেই পাম্প শু এবং ছড়ি, প্রভেদের মধ্যে এখন কেবল সেই বাঘ-আঁকা রুমালখানি বুকপকেট ছাড়িয়া তাঁহার কণ্ঠে জড়ানো। মহাপাত্র এই দিকেই আসিতেছিল, সুমুখে আসিতেই অপূর্ব ডাকিয়া কহিল, কি হে গিরীশ, আমাকে চিনতে পারো? কোথায় চলেচ?

গিরীশ শশব্যস্তে একটা মস্ত নমস্কার করিয়া কহিল, আজ্ঞে, চিনতে পারি বৈ কি বাবুমশায়। কোথায় আগমন হচ্ছেন?

অপূর্ব সহাস্যে কহিল, আপাতত ভামো যাচ্চি। তুমি কোথায়?

গিরীশ কহিল, আজ্ঞে, এনাঞ্জাং থেকে দুজন বন্ধু নোক আসার কথা ছিল,—আমাকে কিন্তু বাবু ঝুটমুট হয়রান করা। হাঁ, আনে বটে কেউ কেউ আপিং সিদ্ধি নুকিয়ে, কিন্তু, আমি বাবু ভারী ধর্মভীরু মানুষ। বলি কাজ কি বাপু জুচ্চুরিতে—কথায় বলে পরোধর্ম ভয়াবয়। লল্লাটের লেখা তো খণ্ডাবে না।

অপূর্ব হাসিয়া কহিল, আমারও তো তাই বিশ্বাস। কিন্তু তোমার বাপু একটা ভুল হয়েছে, আমি পুলিশের লোক নই, আফিম সিদ্ধির কোনো ধার ধারিনে,—সেদিন কেবল তামাশা দেখতেই গিয়েছিলাম।

তলওয়ারকর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতেছিল, কহিল, বাবুজি, ম্যয় নে আপকো তো জরুর কঁহা দেখা—

গিরীশ কহিল, আশ্চয্যি নেহি হ্যায় বাবু সাহেব, নোকরির বাস্তে কেত্তা যায়গায় তো ঘুমতা হ্যায়,—

অপূর্বকে বলিল, কিন্তু আমার ওপর মিথ্যে সন্দেহ রাখবেন না বাবুমশায়, আপনাদের নজর পড়লে চাকরিও একটা জুটবে না। বামুনের ছেলে, বাংলা লেখাপড়া, শাস্তর-টাস্তর সবই কিছু কিছু শিখেছিলাম, কিন্তু এমন অদেষ্ট যে—বাবুমশায় আপনারা—

অপূর্ব কহিল, আমি ব্রাহ্মণ।

আজ্ঞে, তা হলে নমস্কার। এখন তবে আসি,—বাবুসাহেব, রাম রাম—বলিতে বলিতে গিরীশ মহাপাত্র একটা উদগত কাশির বেগ সামলাইয়া লইয়া ব্যগ্রপদে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল।

অপূর্ব কহিল, এই সব্যসাচীটির পিছনেই কাকাবাবু সদলবলে এদেশ ওদেশ করে বেড়াচ্ছেন তলওয়ারকর। বলিয়া সে হাসিল। কিন্তু এই হাসিতে তলওয়ারকর যোগ দিল না। পরক্ষণে বাঁশি বাজাইয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিলে সে হাত বাড়াইয়া বন্ধুর করমর্দন করিল, কিন্তু তখনও মুখ দিয়া তাহার কথাই বাহির হইল না। নানা কারণে অপূর্ব লক্ষ করিল না, কিন্তু করিলে দেখিতে পাইত এই মুহূর্তকালের মধ্যে রামদাসের প্রশস্ত উজ্জ্বল ললাটের উপরে যেন কোন এক অদৃশ্য মেঘের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে, এবং সেই সুদূর দুর্নিরীক্ষ্য লোকেই তাহার সমস্ত মনশ্চক্ষু একেবারে উধাও হইয়া গিয়াছে।

অপূর্ব প্রথম শ্রেণির যাত্রী, তাহার কামরায় আর কেহ লোক ছিল না। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে সে পিরানের মধ্যে হইতে পৈতা বাহির করিয়া বিনা জলেই সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিল, এবং যে-সকল ভোজ্যবস্তু শাস্ত্রমতে স্পর্শদুষ্ট হয় না জানিয়া সে সঙ্গে আনিয়াছিল, পিতলের পাত্র হইতে বাহির করিয়া আহার করিল, জল ও পান তাহার ব্রাহ্মণ আরদালি পূর্বাহ্ণেই রাখিয়া গিয়াছিল, এবং শয্যাও সে প্রস্তুত করিয়া দিয়া গিয়াছিল, অতএব রাত্রির মতো অপূর্ব ভোজনাদি শেষ করিয়া হাতমুখ ধুইয়া পরিতৃপ্ত সুস্থচিত্তে শয্যা আশ্রয় করিল। তাহার ভরসা ছিল প্রভাতকাল পর্যন্ত আর তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিবে না। কিন্তু ইহা যে কতবড়ো ভ্রম তাহা কয়েকটা স্টেশন পরেই সে অনুভব করিল। সেই রাত্রির মধ্যে বার-তিনেক তাহার ঘুম ভাঙাইয়া পুলিশের লোক তাহার নাম ও ধাম ও ঠিকানা লিখিয়া লইয়াছে। একবার সে বিরক্ত হইয়া প্রতিবাদ করায় বর্মা সব-ইনস্পেক্টর সাহেব কটুকণ্ঠে জবাব দেয়, তুমি তো ইউরোপিয়ান নও।

অপূর্ব কহে, না। কিন্তু আমি তো ফার্স্ট ক্লাস প্যাসেঞ্জার,—রাত্রে তো আমার তুমি ঘুমের বিঘ্ন করিতে পারো না।

সে হাসিয়া বলে, ও নিয়ম রেলওয়ে কর্মচারীর জন্য,—আমি পুলিশ; ইচ্ছা করিলে আমি তোমাকে টানিয়া নীচে নামাইতে পারি।

(সম্পাদিত)

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬—১৯৩৮) : জন্ম হুগলি জেলার দেবানন্দপুরে। রবীন্দ্র সমসাময়িক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্ণময় জীবনের অধিকারী শরৎচন্দ্রের লেখায় তাঁর অভিজ্ঞতার ছাপ স্পষ্ট। বাংলার গ্রাম-জীবন এবং মধ্যবিত্ত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সম্ভাবনা তাঁর গল্প উপন্যাসে আশ্চর্য মুন্সিয়ানায় ভাষারূপ পেয়েছে। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে রয়েছে— 'বড়দিদি', 'পল্লীসমাজ', 'দেবদাস', 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি',' চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ', 'শ্রীকান্ত', 'শেষ প্রশ্ন' প্রভৃতি। তাঁর লেখা ছোটোগল্পগুলির মধ্যে 'লালু', 'মহেশ', 'অভাগীর স্বর্গ' ইত্যাদি পাঠক মহলে আজও সমাদৃত। পাঠ্য রচনাটি তাঁর 'পথের দাবী' উপন্যাসের অংশবিশেষ। বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি পক্ষপাতের অভিযোগে এই উপন্যাসটি ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল।

প্রভাবতী সম্ভাষণ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বৎসে প্রভাবতি! তুমি, দয়া, মমতা ও বিবেচনায় বিসর্জন দিয়া, এ জন্মের মতো, সহসা সকলের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়াছ। কিন্তু আমি, অনন্যচিত্ত হইয়া, অবিচলিত স্নেহভরে তোমার চিন্তায় নিরন্তর এরূপ নিবিষ্ট থাকি যে, তুমি এক মুহূর্তের নিমিত্ত, আমার দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইতে পার নাই। প্রতিক্ষণেই, আমার স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে — যেন, তুমি বসিয়া আছ, আমায় অন্য মনে চলিয়া যাইতে দেখিয়া, 'নীনা' বলিয়া, করপ্রসারণপূর্বক, কোলে লইয়া বলিতেছ। যেন, তুমি উপরের জানালা হইতে দেখিতে পাইয়া, 'আয় না' বলিয়া, সলীল করসঞ্চালন সহকারে, আমায় আহ্বান করিতেছ। যেন, আমি আহার করিতে গিয়া, আসনে উপবিষ্ট হইয়া, তোমার পূজ্যপাদ পিতামহদেবীকে, প্রভাবতী কোথায়, এই জিজ্ঞাসা করিতেছি। তুমি শ্রবণমাত্র, সত্ত্বর পদসঞ্চারে আসিয়া, 'এই আমি এসেছি' বলিয়া, প্রফুল্লবদনে, আমার ক্রোড়ে উপবেশন করিতেছ। যেন তুমি, আমার ক্রোড়ে বসিয়া আহার করিতে করিতে, 'শোলো' বলিয়া, আমার জানুতে মস্তক বিন্যস্ত করিয়া শয়ন করিতেছ। যেন, আমি আহারান্তে আসন হইতে উত্থিত হইবামাত্র, তুমি আমার সঙ্গে ঝগড়া করিতেছ; আর সকলে, সাতিশয় আহ্লাদিত মনে, সহাস্যবদনে, শ্রবণ ও অবলোকন করিতেছেন। যেন, আমি বিকালে বাড়ির ভিতরে জল খাইতেছি; তুমি ক্রোড়ে

বসিয়া, আমার সঙ্গে জল খাইতেছ ; এবং জল খাওয়ার পর, আমি মুখে সুপারি দিবামাত্র, তুমি 'দুখুনি দে' বলিয়া, অঙ্গুলি দ্বারা, আমার মুখ হইতে সুপারি বহিষ্কৃত করিয়া লইতেছ। যেন, তুমি বাহিরে আসিবার নিমিত্ত, আমার ক্রোড়ে আরোহণ করিয়াছ, এবং সিঁড়ি নামিবার পূর্বক্ষণে, আমার চিবুকধারণপূর্বক, আকুল চিত্তে বলিতেছ, 'নাফাস্‌নি, পড়ে যাব'। আমি কৌতুক করিবার নিমিত্ত বলিতেছি না আমি লাফাব। তুমি অমনি, ঈষৎ কোপাবিষ্ট হইয়া, তোমার জননীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিতেছ, 'দেখ্‌ দিখি মা, আমার কথা শোনে না'। যেন, তোমার দাদারা, উনি আর তোমায় ভালো বাসিবেন না, এই বলিয়া ভয়প্রদর্শন করিতেছে। তুমি তাহা পরিহাস বলিয়া বুঝিতে না পারিয়া, পাছে আমি আর না ভালোবাসি, এই আশঙ্কায় আকুলচিত্ত হইয়া, 'ভালো বস্‌বি, ভালো বস্‌বি' এই কথা আমায় অনুপমেয় শিরশ্চালন সহকারে বারংবার বলিতেছ। যেন, আমি, খাব খাব বলিয়া, তোমার মুখচুম্বনের নিমিত্ত, আগ্রহপ্রদর্শন করিতেছি। তুমি, 'এই খা' বলিয়া, ডাইনের গাল ফিরাইয়া দিতেছ। আমি, ও খাব না বলিয়া, মুখ ফিরাইতেছি। তুমি, 'তবে এই খা' বলিয়া, বামের গাল ফিরাইয়া দিতেছ। আমি, ও খাব না বলিয়া, মুখ ফিরাইতেছি। অবশেষে, তুমি, আর কিছু না বলিয়া, আপন অধর আমার অধরে অর্পিত করিতেছ।

এইরূপে, আমি সর্বক্ষণ, তোমার অদ্ভুত মনোহর মূর্তি ও নিরতিশয়প্রীতিপদ অনুষ্ঠান সকল অবিকল প্রত্যক্ষ করিতেছি ;কেবল তোমার কোলে লইয়া, তোমার লাবণ্যপূর্ণ কোমল কলেবর পরিস্পর্শে, শরীর অমৃতরসে অভিষিক্ত করিতে পারিতেছি না। দৈবযোগে এক দিন, দিবাভাগে, আমার নিদ্রাবেশ ঘটিয়াছিল। কেবল, সেই দিন, সেই সময়ে, ক্ষণকালের জন্য, তোমায় পাইয়াছিলাম। দর্শনমাত্র, আহ্লাদে অধৈর্য হইয়া, অভূতপূর্ব আগ্রহ সহকারে ক্রোড়ে লইয়া, প্রগাঢ় স্নেহভরে বাহু দ্বারা পীড়নপূর্বক, সজল নয়নে তোমার মুখচুম্বনে প্রবৃত্ত হইতেছি, এমন সময়ে, এক ব্যক্তি, আহ্বান করিয়া, আমার নিদ্রাভঙ্গ করিলেন। এই আকস্মিক মর্মভেদী নিদ্রাভঙ্গ দ্বারা, সেদিন, যে বিষম ক্ষোভ ও ভয়ানক মনস্তাপ পাইয়াছি, তাহা বলিয়া ব্যক্ত করিবার নহে।

বৎসে! তোমার কিছুমাত্র দয়া ও মমতা নাই। যখন তুমি, এত সত্বর চলিয়া যাইবে বলিয়া, স্থির করিয়া রাখিয়াছিলে, তখন তোমার সংসারে না আসাই সর্বাংশে উচিত ছিল। তুমি স্বল্প সময়ের জন্য আসিয়া, সকলকে কেবল মর্মান্তিক বেদনা দিয়া গিয়াছ। আমি যে, তোমার অদর্শনে, কত যাতনাভোগ করিতেছি, তাহা তুমি একবারও ভাবিতেছ না।

বৎসে! কিছুদিন হইল আমি নানা কারণে সাতিশয় শোচনীয় অবস্থার অবস্থাপিত হইয়াছি। সংসার নিতান্ত বিরস ও বিষময় হইয়া উঠিয়াছে। কেবল এক পদার্থ ভিন্ন, আর কোনও বিষয়েই, কোনও অংশে, কিঞ্চিমাত্র সুখবোধ বা প্রীতিলাভ হইত না। তুমি আমার সেই পদার্থ ছিলে। ইদানীং, একমাত্র তোমায় অবলম্বন করিয়া, এই বিষময় সংসার অমৃতময় বোধ করিতেছিলাম। যখন, চিত্ত বিষম অসুখে ও উৎকট বিরাগে পরিপূর্ণ হইয়া, সংসার নিরবচ্ছিন্ন যন্ত্রণাভবন বলিয়া প্রতীয়মান হইত, সে সময়ে তোমায় কোলে লইলে, ও তোমার মুখচুম্বন করিলে, আমার সব শরীর তৎক্ষণাৎ যেন অমৃতরসে অভিষিক্ত হইত। বৎসে! তোমার কি অদ্ভুত মোহিনী শক্তি ছিল, বলিতে পারি না। তুমি অন্ধতমসাচ্ছন্ন গৃহে প্রদীপ্ত প্রদীপের এবং চিরশুষ্ক মরুভূমিতে প্রভূত প্রস্রবণের, কার্য করিতেছিলে। অধিক আর কি বলিব ইদানীং তুমিই আমার জীবনযাত্রায় একমাত্র অবলম্বন হইয়াছিলে। সুতরাং, তোমার অসদ্ভাবে, আমার কীদৃশ শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা তুমি, ইচ্ছা করিলে, অনায়াসে, স্বীয় অনুভবপথে উপনীত করিতে পার।

কিন্তু, এক বিষয় ভাবিয়া, আমি কিয়ৎ অংশে, বীতশোক ও আশ্বাসিত হইয়াছি। বৎসে! তুমি এমন শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে যে, ব্যক্তিমাত্রেই, তোমার অদ্ভুত মনোহর মূর্তি ও প্রভূতমাধুরীপূর্ণ ভাবভঙ্গী দৃষ্টিগোচর করিয়া, নিরতিশয় পুলকিত ও চমৎকৃত হইতেন। তুমি সকলের নয়নতারা ছিলে। সকলেই তোমায় আপন প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করিতেন। এই নগরের অনেক পরিবারের সহিত আমার প্রণয় ও পরিচয় আছে ; কিন্তু কোনও পরিবারেই , তোমার ন্যায়, অবিসংবাদে সব-সাধারণের নিরতিশয় স্নেহভূমি ও আদরভাজন অপত্য, এ পর্যন্ত, আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। তুমি যে স্বল্পকাল সংসারে ছিলে, তাহা আদরে আদরে অতিবাহিত করিয়া গিয়াছে, অস্নেহ বা অনাদর কাহারে বলে এক মুহূর্তের নিমিত্ত, তোমায় তাহার অনুমাত্র অনুভব করিতে হয় নাই।

কিন্তু এই নৃশংস সংসারে দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিলে, উত্তরকালে তোমার ভাগ্যে কী ঘটত তাহার কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। হয়ত, ভাগ্যগুণে সৎপাত্রে প্রতিপাদিত্য ও সৎ পরিবারে প্রতিষ্ঠাতা, হইয়া অবিচ্ছিন্ন সুখসম্ভোগে কালহরণ করিতে ; নয়ত ভাগ্যদোষে, অসৎ পাত্রের হস্তগতা ও অসৎ পরিবারের করাল কবলে পতিতা হইয়া অবিচ্ছিন্ন দুঃখসম্ভোগে কালাতিপাত করিতে হইত। যদি, পরমযত্নে ও পরম আদরে পরিবর্ধিত করিয়া, পরিশেষে, তুমি অবস্থার বৈগুণ্যনিবন্ধন দুঃসহ ক্লেশপরম্পরায় কালযাপন করিতেছ, ইহা দেখিতে হইত, তাহা হইলে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। বোধ হয়, তোমার অতর্কিত অন্তর্ধাননিবন্ধন যাতনা অপেক্ষা, সে যাতনা বহু সহস্র গুণে গরীয়সী হইত। তুমি, স্বল্পকালে সংসারব্রতের উদ্‌যাপন করিয়া, আমাদের সেই সম্ভাবিত অতি বিষম আন্তরিক যাতনাভোগের সম্পূর্ণরূপ অপসারণ করিয়াছ। তোমায় যে, ক্ষণকালের জন্য, কাহারও নিকট কোনও অংশে, অনুমাত্র অস্নেহ বা অনাদরের আস্পদ হইতে হইল না, আদরে আদরে নরলীলা সম্পন্ন করিয়া গেলে, ইহা ভাবিয়া, আমি আমার অবোধ মনকে কথঞ্চিৎ প্রবোধ দিতে পারিব।

বিশেষত দীর্ঘকাল নরলোকবাসিনী হইলে, অপরিহরণীয় পরিণয়পাশে বদ্ধ হইয়া, প্রৌঢ় অবস্থায়, তোমার যে সকল লীলা ও অনুষ্ঠান করিতে হইত, নিতান্ত শৈশব অবস্থাতেই, তুমি তৎসমুদয় সম্যক সম্পন্ন করিয়া গিয়াছ। স্বভাবসিদ্ধ অদ্ভুত কল্পনাশক্তির প্রভাববলে, তুমি শ্বশুরালয় প্রভৃতি উদ্ভাবিত করিয়া লইয়াছিলে। কখনও কখনও, স্নেহ ও মমতার আতিশয্যপ্রদর্শনপূর্বক, ঐকান্তিক ভাবে, তনয়ের লালনপালনে বিলক্ষণ ব্যাপৃত হইতে। কখনও কখনও, 'তাহার কঠিন পীড়া হইয়াছে' বলিয়া দুর্ভাবনায় অভিভূত হইয়া, বিষণ্ণ বদনে, ধরাসনে শয়ন করিয়া থাকিতে। কখনও কখনও , 'শ্বশুরালয় হইতে অশুভ সংবাদ আসিয়াছে' বলিয়া ম্লান বদনে ও আকুল হৃদয়ে, কালযাপন করিতে। কখনও কখনও, 'স্বামী আসিয়াছেন' বলিয়া, ঘোমটা দিয়া সঙ্কুচিত ভাবে, এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতে ; এবং, সেই সময়ে, কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, লজ্জাশীলা কুলমহিলার ন্যায়, অতি মৃদু স্বরে উত্তর দিতে। কখনও কখনও, 'পুত্রটি একলা পুকুরের ধারে গিয়াছিল, আর একটু হইলেই ডুবিয়া পড়িত', এই বলিয়া, সাতিশয় শোকাভিভূত হইয়া, নিরতিশয় আকুলতা প্রদর্শন করিতে। কখনও কখনও, 'শ্বাশুড়ির পীড়ার সংবাদ আসিয়াছে' বলিয়া, অবিলম্বে শ্বশুরালয়ে যাইবার নিমিত্ত, সজ্জা করিতে।

এইরূপে, তুমি সংসারযাত্রা সংক্রান্ত সকল লীলা সম্পন্ন করিয়া গিয়াছ। বোধ হয়, যদি এই পাপিষ্ঠ নৃশংস নরলোকে অধিক দিন থাক, উত্তরকালে বিবিধ যাতনাভোগ একান্ত অপরিহার্য, ইহা নিশ্চিত বুঝিতে পারিয়াছিলে। এই জন্যই, ঈদৃশ স্বল্প সময়ে, যথাসম্ভব, সাংসারিক ব্যাপার সকল সম্পন্ন করিয়া, সত্বর অন্তর্হিত হইয়াছ। তুমি স্বল্প কালে নরলোক হইতে অপসৃত হইয়া, আমার বোধে, অতি সুবোধের কাজ করিয়াছ। অধিক কাল থাকিলে, আর কি অধিক সুখভোগ করিতে ; হয়ত, অদৃষ্টবৈগুণ্যবশত, অশেষবিধ যাতনাভোগের একশেষ ঘটিত। সংসার যেরূপ বিরুদ্ধ স্থান, তাহাতে, তুমি দীর্ঘজীবনী হইলে, কখনই, সুখে ও স্বচ্ছন্দে, জীবনযাত্রার সমাধান করিতে পারিত না।

কিন্তু, এক বিষয়ে, আমার হৃদয়ে নিরতিশয় ক্ষোভ জন্মিয়া রহিয়াছে। অন্তিম পীড়াকালে, তুমি উৎকট পিপাসায় সাতিশয় আকুল হইয়া, জলপানের নিমিত্ত, নিতান্ত লালায়িত হইয়া ছিলে। কিন্তু, অধিক জল দেওয়া চিকিৎসকের মতানুযায়ী নয় বলিয়া, তোমায় ইচ্ছানুরূপ জল দিতে পারি নাই। ঔষধ সেবনান্তে, কিঞ্চিৎ দিবার পর আকুল বচনে, 'আর খাব' 'আর খাব' বলিয়া জলের নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি লালসাপ্রদর্শন করিতে। কিন্তু আমি, ইচ্ছানুরূপ, জলপ্রদানের পরিবর্তে, তোমায় কেবল প্রবঞ্চনাবাক্যে সান্ত্বনাপ্রদানের চেষ্টা করিতাম। যদি তৎকালে জানিতে পারিতাম, তুমি অবধারিত পলায়ন করিবে, তাহা হইলে, কখনই, তোমার পিপাসার যন্ত্রণায় অস্থির ও কাতর হইতে দিতাম না ; ইচ্ছানুরূপ জলপান করাইয়া নিঃসন্দেহে, তোমার উৎকট পিপাসা নিবন্ধন অসহ্য যাতনার সর্বতোভাবে নিবারণ করিতাম। সে যাহা হউক, বৎসে। তুমি উৎকট পিপাসায় সাতিশয় আকুল হইয়া , জলপ্রার্থনাকালে আমার দিকে, বারংবার যে কাতর দৃষ্টিপাত করিয়াছিলে, তাহা আমার হৃদয়ে বিষদিগ্ধ শল্যের ন্যায়, চিরদিনের নিমিত্ত হইয়া রহিয়াছে। যদি তোমার সকল কাণ্ড বিস্মৃত হই, ঐ মর্মভেদী কাতর দৃষ্টিপাত, এক মুহূর্তের নিমিত্ত, আমার স্মৃতিপথ হইতে অপসারিত হইবেক না। যদি তাহা বিস্মৃত হইতে পারি, তাহা হইলে, আমার মতো পামর ও পাষণ্ড ভূমণ্ডলে আর নাই।

বৎসে! আমি যে তোমায় আন্তরিকভাবে ভালো বাসিতাম, তাহা তুমি বিলক্ষণ জান। আর তুমি যে আমায় আন্তরিকভাবে ভালোবাসিতে, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। আমি তোমায় অধিকক্ষণ না দেখিলে, যার পর নাই অসুখী ও উৎকণ্ঠিত হইতাম। তুমিও, আমায় অধিকক্ষণ না দেখিতে পাইলে যার পর নাই অসুখী ও উৎকণ্ঠিত হইতে; এবং আমি কোথায় গিয়াছি, কখন আসিব, আসিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন, অনুক্ষণ এই অনুসন্ধান করতে। এক্ষণে, এত দিন তোমায় দেখিতে না পাইয়া আমি অতি বিষম অসুখে কালযাপন করিতেছি। কিন্তু, তুমি এত দিন আমায় না দেখিয়া, কীভাবে কালযাপন করিতেছ, তাহা জানিতে পারিতেছি না। বৎসে ! যদিও তুমি, নিতান্ত নির্মম হইয়া, এ জন্মের মতো, অন্তর্হিত হইয়া, এবং আমার নিমিত্ত আকুলচিত্ত হইতেছ কিনা, জানতে পারিতেছি না; আর হয়ত, এতদিনে আমায় সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছ ; কিন্তু, আমি তোমার, কস্মিন কালেও বিস্মৃত হইতে পারিব না। তোমার অদ্ভুত মনোহর মূর্তি, চিরদিনের নিমিত্ত, আমার চিত্রপটে চিত্রিত থাকিবেক। কালক্রমে পাছে তোমায় বিস্মৃত হই, এই আশঙ্কায়, তোমার যার পর নাই চিত্ততারিণী ও চমৎকারিণী লীলা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম। সতত পাঠ করিয়া, তোমায় সর্বক্ষণ স্মৃতিপথে জাগরুক রাখিব, তাহা হইলে, আর আমার তোমায় বিস্মৃত হইবার অণুমাত্র আশঙ্কা রহিল না।

বৎসে! তোমায় আর অধিক বিরক্ত করিব না; একমাত্র বাসনা ব্যক্ত করিয়া বিরত হই — যদি তুমি পুনরায় নরলোকে আবির্ভূত হও, দোহাই ধর্মের এইটি করিও যাঁহারা তোমার স্নেহপাশে বদ্ধ হইবেন, যেন তাঁহাদিগকে, আমাদের মতো, অবিরত দুঃসহ শোকদহনে দগ্ধ হইয়া, যাবজ্জীবন যাতনাভোগ করিতে না হয়।

(সম্পাদিত)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০—১৮৯১) : জন্ম মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে। বাল্যকাল থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। সংস্কৃত কলেজ থেকে বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন। পরবর্তীকালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন। শিক্ষাবিস্তার, স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার ছাড়াও বিধবাবিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ-রোধ ইত্যাদি বহুবিধ সমাজ-সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর রচিত মৌলিক ও অনূদিত বহু গ্রন্থের মধ্যে 'আখ্যানমঞ্জরী', 'বোধোদয়', 'ঋজুপাঠ', 'কথামালা', 'বর্ণ পরিচয়', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস', 'ভ্রান্তিবিলাস', 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব', 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচনা একদিকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তেজস্বী প্রতিবাদ, অন্যদিকে মানবিকতার উজ্জ্বল প্রভায় ভাস্বর।

সিন্ধুতীরে

সৈয়দ আলাওল

কন্যারে ফেলিল যথা জলের মাঝারে তথা
দিব্য পুরী সমুদ্র মাঝার।
অতি মনোহর দেশ নাহি তথা দুঃখ ক্লেশ
সত্য ধর্ম সদা সদাচার॥
সমুদ্রনৃপতি সুতা পদ্মা নামে গুণযুতা
সিন্ধুতীরে দেখি দিব্যস্থান।
উপরে পর্বত এক ফল ফুলে অতিরেক
তার পাশে রচিল উদ্যান॥
নানা পুষ্প মনোহর সুগন্ধি সৌরভতর
নানা ফল বৃক্ষ সুলক্ষণ।
তাহাতে বিচিত্র টঙ্গি হেমরত্নে নানা রঙ্গি
তথা কন্যা থাকে সর্বক্ষণ॥

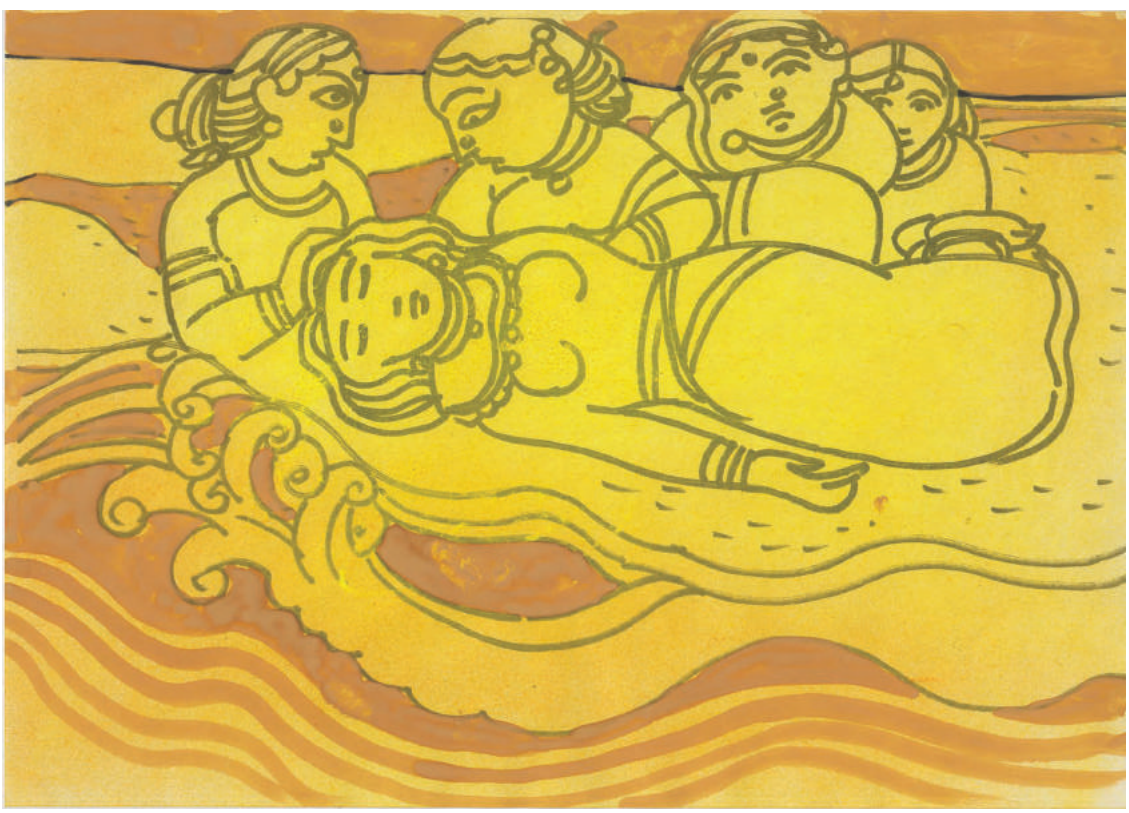

পিতৃপুরে ছিল নিশি নানাসুখে খেলি হাসি
যদি হৈল সময় প্রত্যুষ।
সখীগণ করি সঙ্গে আসিতে উদ্যানে রঙ্গে
সিন্ধুতীরে রহিছে মাঞ্জস॥
মনেতে কৌতুক বাসি তুরিত গমনে আসি
দেখে চারি সখী চারিভিত।
মধ্যেতে যে কন্যাখানি রূপে অতি রম্ভা জিনি
নিপতিতা চেতন রহিত॥
দেখিয়া রূপের কলা বিস্মিত হইল বালা
অনুমান করে নিজ চিতে।
ইন্দ্রশাপে বিদ্যাধরি কিবা স্বর্গভ্রষ্ট করি
অচৈতন্য পড়িছে ভূমিতে॥
বেকত দেখিয়ে আঁখি তেন স-বসন সাক্ষী
বেথানিত হৈছে কেশ বেশ।
বুঝি সমুদ্রের নাও ভাঙ্গিল প্রবল বাও
মোহিত পাইয়া সিন্ধু-ক্লেশ॥
চিত্রের পোতলি সমা নিপতিত মনোরমা
কিঞ্চিৎ আছয় মাত্র শ্বাস।
অতি স্নেহ ভাবি মনে বলে পদ্মা ততক্ষণে
বিধি মোরে না কর নৈরাশ॥
পিতার পুণ্যের ফলে মোহর ভাগ্যের বলে
বাহুরক কন্যার জীবন।
চিকিৎসিমু প্রাণপণ কৃপা কর নিরঞ্জন
দুখিনীরে করিয়া স্মরণ॥
সখী সবে আজ্ঞা দিল উদ্যানের মাঝে নিল
পঞ্চজনে বসনে ঢাকিয়া।
অগ্নি জ্বালি ছেকে গাও কেহ শিরে কেহ পাও
তন্ত্রে মন্ত্রে মহৌষধি দিয়া॥
দণ্ড চারি এই মতে বহু যত্নে চিকিৎসিতে
পঞ্চকন্যা পাইলা চেতন।
শ্রীযুত মাগন গুণী মোহন্ত আরতি শুনি
হীন আলাওল সুরচন॥

সৈয়দ আলাওল : সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার জালালপুরে জন্মগ্রহণ করেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অন্যতম প্রধান কবি সৈয়দ আলাওল ঘটনাচক্রে আরাকানরাজের অশ্বারোহী সৈন্যদলে নিযুক্ত হন। তাঁর প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ রচনা 'পদ্মাবতী'। 'সয়ফুলমুলুক বাদিওজ্জমাল' প্রধানমন্ত্রী-মাগন ঠাকুরের অনুরোধে তিনি রচনা করেন। এছাড়াও তিনি 'সপ্তপয়কর', 'তোহফা', 'দারাসেকেন্দরনামা', 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী' প্রভৃতি গ্রন্থ অনুবাদ ও রচনা করেন। পাঠ্যাংশটি তাঁর 'পদ্মাবতী' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া।

অদল বদল

পান্নালাল প্যাটেল

হোলির দিনের পড়ন্ত বিকেল। নিম গাছের নীচে গাঁয়ের একদল ছেলে জড়ো হয়ে ধুলো ছোড়াছুড়ি করে খেলছিল।

হাত ধরাধরি করে অমৃত ও ইসাব ওদের কাছে এল। দুজনের গায়েই সেদিনকার তৈরি নতুন জামা। রং, মাপ, কাপড় — সব দিক থেকেই একরকম। এরা দুজনে একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়ে। রাস্তার মোড়ে এদের বাড়ি দুটোও মুখোমুখি। দুজনের বাবাই পেশায় চাষি, জমিও প্রায় সমান সমান। দুজনকেই সাময়িক বিপদ আপদে সুদে ধার নিতে হয়। বলতে গেলে ছেলেদুটোর সবই একরকম, তফাত শুধু এই যে, অমৃতের বাবা-মা আর তিন ভাই রয়েছে, ইসাবের আছে শুধু তার বাবা।

দুই বন্ধুতে মিলে শান-বাঁধানো ফুটপাথে এসে বসতে, ওদের একরকম পোশাক দেখে দলের একটি

ছেলে বলল, 'ঠিক, তোরা দুজনে কুস্তি কর তো, দেখি তোরা শক্তিতেও সমান-সমান, না একজন বড়ো পালোয়ান।'

আরেকটি ছেলে চেঁচিয়ে উঠল, 'লড়ে যা তোরা, বেশ মজা হবে।'

ইসাব অমৃতের দিকে তাকাল। অমৃত দৃঢ়স্বরে বলল, 'না, তাহলে মা আমাকে ঠ্যাঙ্গাবে।'

অমৃতের অত জোর দিয়ে বলার কারণ ছিল। বাড়ি থেকে বেরাবার সময় ওর মা সাবধান করে দিয়েছিলেন, 'নতুন জামা পাবার জন্য তুমি কী কাণ্ডটাই না করেছিলে; এখন যদি তুমি জামা ময়লা করে বা ছিঁড়ে আসো, তাহলে তোমার কপালে কী আছে মনে রেখো।'

অমৃত সত্যি তার বাবা-মাকে খুব জ্বালিয়েছিল। শোনা মাত্র অমৃত ফতোয়া জারি করে দিল, ঠিক ইসাবের মতো জামাটি না পেলে ও স্কুলে যাবে না।

মা ওকে অনেক বুঝিয়েছিল, 'ইসাবকে ক্ষেতে কাজ করতে হয় বলে ওর জামা ছিঁড়ে গেছে, আর তোরটা তো প্রায় নতুনই রয়েছে।'

'মোটেই না,' বলে কাঁদতে কাঁদতে অমৃত ওর জামার একটা ছেঁড়া জায়গায় আঙুল ঢুকিয়ে আরো ছিঁড়ে দেয়।

মা তখন ওকে বেকায়দায় ফেলার জন্য বললেন, 'নতুন জামা দেবার আগে ইসাবের বাবা ওকে খুব মেরেছিলেন, তুইও সেরকম মার খেতে রাজি আছিস?'

অমৃত এতেও পিছপা হতে রাজি নয়। ও মরিয়া হয়ে বলল, 'ঠিক আছে, আমাকে বেঁধে রাখো! মারো! কিন্তু তোমাকে ইসাবের মতো একটা জামা আমার জন্য জোগাড় করতেই হবে।'

ইসাবের মা এসব ঝামেলা থেকে বাঁচবার জন্য বললেন, 'ঠিক আছে, তোর বাবাকে গিয়ে বলগে।'

অমৃত জানত মা 'না' বললে ওর বাবার রাজি হবার সম্ভাবনা খুবই কম। কিন্তু অত সহজে হাল ছাড়ার পাত্রও সে নয়। ও স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিল, খাওয়া ছেড়ে দিল এবং রাত্তিরে বাড়ি ফিরতে রাজি হলো না। শেষমেশ ওর মা হাল ছেড়ে দিয়ে অমৃতের বাবাকে ওর জন্য নতুন জামা কিনে দিতে রাজি করালেন। এর পর উনি গিয়ে ইসাবের বাবার গোয়ালঘর থেকে লুকিয়ে থাকা অমৃতকে বাড়ি নিয়ে এলেন।

সুন্দর সাজগোজ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে অমৃতের একেবারেই ইচ্ছে ছিল না জামাকাপড় নোংরা হয় এমন কিছু করতে। বিশেষ করে ইসাবের সঙ্গে কুস্তি লড়তে তো একেবারেই গররাজি।

এমন সময় ছেলেছোকরার দঙ্গল থেকে একজন এসে হাত দিয়ে অমৃতের গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'এসো, আমরা কুস্তি লড়ি।'

এই বলে সে অমৃতকে খোলা মাঠে নিয়ে এল। অমৃত ওর বাঁধন কেটে বেরুবার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'দেখ্ কালিয়া, আমি কুস্তি লড়তে চাই না, আমাকে ছেড়ে দে।' কালিয়া তো ওকে ছাড়লই না, বরং ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দিল। ছেলের দল আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, 'কালিয়া জিতেছে, অমৃত হেরে গেছে, কী মজা, কী মজা।'

ইসাবের মেজাজ চড়ে গেল। ও কালিয়ার হাত ধরে বলল, 'আয়, আমি তোর সঙ্গে লড়ব।' কালিয়া ইতস্তত করছিল, কুস্তি শুরু হয়ে গেল। ইসাব ল্যাং মারতে কালিয়া ব্যাঙের মতো হাত পা ছড়িয়ে মাটিতে পড়ে গিয়ে চ্যাঁচাতে লাগল।

তামাশা করে হলেও এখন ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে পড়েছে এবং কালিয়ার বাবা-মা এসে ওদের পিটুতে পারে বুঝতে পেরে সবাই যে যেদিকে পারে পালিয়ে গেল।

অমৃত আর ইসাবও রণভূমি ত্যাগ করল। কিছুটা যেতেই অমৃতের নজরে এল যে ইসাবের জামার পকেট ও ছ'ইঞ্চি পরিমাণ কাপড় ছিঁড়ে গেছে। ওরা ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। ওরা জামা কতটা ছিঁড়েছে পরীক্ষা করছে, এমন সময় শুনতে পেল ইসাবের বাবা ইসাবকে ডাকছেন।

ওদের তখন বুকের ধুকপুকুনি বন্ধ হবার জোগাড়, ওরা জানে ইসাবের বাবা ছেঁড়া শার্ট দেখা মাত্র ওর চামড়া তুলে নেবে। উনি সুদখোরের কাছ থেকে টাকা ধার করে অনেক বাছাবাছি করে কাপড় কিনে জামা সেলাই করিয়েছিলেন।

ইসাবের বাবা আবার চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কে কাঁদছে, ইসাব কোথায়?'

হঠাৎ অমৃতের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল, ও ইসাবকে টানতে টানতে বলল, 'আমার সঙ্গে আয়।' ওদের দুই বাড়ির মাঝখানে ঢুকে অমৃত জামার বোতাম খুলতে লাগল। ও হুকুম দিল, 'তোর জামা খুলে আমারটা পর।'

ইসাব বলল, 'তোর কী হবে, তুই কী পরবি?'

অমৃত বলল, 'শিগগির কর, নয়তো কেউ দেখে ফেলবে। আমি তোরটা পরব।'

'ইসাব জামা খুলতে লাগল, যদিও অমৃত কী করতে চাইছে বুঝতে পারছিল না, বলল, ''জামা অদল-বদল? কিন্তু তাতে সুবিধাটা কী হবে, তোকে তো তোর বাবা পিটোবে।'

অমৃত বলল, 'নিশ্চয় ঠ্যাঙ্গাবে, কিন্তু আমাকে বাঁচানোর জন্য তো আমার মা আছে।'

ইসাবের মনে পড়ল, ও দেখেছে যে, অমৃতের বাবা যখনই মারতে গেছেন, অমৃত ওর মায়ের পেছনে লুকিয়েছে। মার হাতে অবশ্য ওকে দু'চার থাপ্পড় খেতে হয়েছে, কিন্তু বাবার ভারী হাতের মারের কাছে ও কিছুই নয়।

ইসাব তবু ইতস্তত করছে, এমন সময় সে খুব কাছে কাউকে কাশতে শুনল, তক্ষুণি ওরা ঝটপট জামা অদল-বদল করে, গলি থেকে বেরিয়ে ধীরে সুস্থে নিঃশব্দে যে যার বাড়ির দিকে চলল।

ভয়ে অমৃতের বুক ঢিপঢিপ করছিল। কিন্তু ওর কপাল ভালো দিনটা ছিল হোলির, সে সময় সবাই জানে কিছুটা ধস্তাধস্তি টানা হ্যাঁচড়া চলে। মা যখন দেখলেন জামাটা ছিঁড়েছে, উনি ভুরু কুঁচকোলেন কিন্তু মাফ করে দিলেন। একটা সুঁচসুতো নিয়ে ছেঁড়া জামাটা রিফু করে দিলেন।

এতে দুজনেরই ভয় কেটে গেল, ওরা আবার হাত ধরাধরি করে গ্রামের ধারে হোলির সময়কার বাজি আর বুড়ির বাড়ি পোড়ানো দেখতে গেল।

একটা ছেলে ওদের জামা বদলানো দেখেছিল, সে ওদের আনন্দ মাটি করার জন্য বলল, 'তোরা অদল-বদল করেছিস, হুম্।'

সে তাদের জামা অদল-বদল করা দেখে ফেলেছে এই আশঙ্কা করে তারা চলে যেতে চাইল। কিন্তু ইতিমধ্যে অন্য ছেলেরাও কি ঘটেছে জেনে চ্যাঁচাতে লাগল, 'অদল-বদল, অদল-বদল!' অমৃত আর ইসাব সরে পড়তে চাইল, কিন্তু ছেলের দল তাদের পেছনে পেছনে 'অদল-বদল, অদল-বদল!' বলে চ্যাঁচাতে লাগল। বাবারা তাদের ব্যাপারটা জেনে ফেলবে মনে করে তারা ভয়ে বাড়ির দিকে ছুটে পালাতে লাগল।

ইসাবের বাবা বাড়ির সামনের দাওয়ায় খাটিয়ায় বসে হুঁকো খাচ্ছিলেন, তিনি ওদের ডাকলেন, 'তোমরা বন্ধুদের কাছ থেকে পালিয়ে আসছ কেন? আমার কাছে এসে বসো।'

ওঁর শান্ত গলা শুনে ওদের চিন্তা হলো, ভাবল, 'যা ভেবেছিলাম তাই হলো, উনি আসল ঘটনাটা জানেন, শুধু ভালোবাসার ভান করছেন।'

ইসবের বাবা পাঠান, উনি দশ বছরের অমৃতকে জড়িয়ে ধরলেন। চেঁচিয়ে বললেন, 'বাহালি বৌদি, আজ থেকে আপনার ছেলে আমার।' বাহালি বৌদি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হাসতে হাসতে বললেন, 'হাসান ভাই, আপনি এক ছেলেকেই দেখে উঠতে পারেন না, তা দুজনকে কী করে সামলাবেন?'

আবেগ ভরা গলায় হাসান বললেন, 'বাহালি বৌদি, অমৃতের মতো ছেলে পেলে আমি একুশজনকেও পালন করতে রাজি আছি।'

কেশে গলা পরিষ্কার করে পাঠান বাহালি বৌদিকে বললেন, 'ছেলে দুটোকে গলিতে ঢুকতে দেখেই ভেবে নিলাম, দেখতে হবে ওরা কী করে।' পাড়া-পড়শি মায়ের দল পাঠানের গল্প শোনার জন্য ঘিরে দাঁড়াল।

উনি অল্প কথায় ছেলেদের জামা বদলের গল্পটা বললেন, আরো বললেন, 'ইসাব অমৃতকে জিজ্ঞেস করেছিল, তোর বাবা যদি তোকে মারে কী হবে? অমৃত কী জবাব দিয়েছিল জানেন? বলেছিল কিন্তু আমার তো মা রয়েছে।'

সজল চোখে পাঠান বললেন, 'কী খাঁটি কথা! অমৃতের জবাব আমাকে বদলে দিয়েছে। ও আমাকে শিখিয়েছে, খাঁটি জিনিস কাকে বলে।'

অমৃত ও ইসাবের পরস্পরের প্রতি ভালোবাসার গল্প শুনে তাঁদেরও বুক ভরে গেল।

ইতিমধ্যে ছেলের দল বাজি আর বুড়ির বাড়ি পোড়ানো দেখে ফিরছিল। তারা ইসাব অমৃতকে ঘিরে বলতে লাগল, 'অমৃত-ইসাব- অদল-বদল, ভাই অদল-বদল।'

এবার অবশ্য ইসাব ও অমৃত অপ্রস্তুত বোধ করল না, বরঞ্চ অদল-বদল বলাতে তাদের ভালোই লাগল।

অদল-বদলের গল্প গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘুরে গ্রাম-প্রধানের কানে গেল। উনি ঘোষণা করলেন, 'আজ থেকে আমরা অমৃতকে অদল আর ইসাবকে বদল বলে ডাকব।'

ছেলেরা খুব খুশি হলো, ক্রমশ গ্রাম পেরিয়ে আকাশ বাতাসও 'অমৃত-ইসাব অদল-বদল, অদল-বদল' এই আওয়াজে মুখরিত হয়ে উঠল।

তরজমা : অর্ঘ্যকুসুম দত্তগুপ্ত

পান্নালাল প্যাটেল (১৯১২-১৯৮৯) : গুজরাতি ভাষার প্রসিদ্ধ লেখক পান্নালাল প্যাটেল রাজস্থানের দুঙ্গারপুরে জন্মগ্রহণ করেন। সাধারণ মানুষ আর গ্রামজীবন তাঁর রচনায় প্রধান গুরুত্ব পেয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়েও তিনি বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পসংগ্রহ 'সাচা সম্মান', 'জিন্দেগি কা খেল', 'লাখ চোরাসি', 'সুখ দুখনান সাথী', 'কোই দেশি কোই পরদেশি', 'আসমানি নজর' প্রভৃতি। সাহিত্যকীর্তির জন্য তিনি ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে রঞ্জিত রাম সুবর্ণচন্দ্রক এবং ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার লাভ করেন।

ঘাস

জীবনানন্দ দাশ

কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলোয়
পৃথিবী ভরে গিয়েছে এই ভোরের বেলা;
কাঁচা বাতাবির মতো সবুজ ঘাস — তেমনি সুঘ্রাণ —
হরিণেরা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে!
আমারও ইচ্ছা করে এই ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো
গেলাসে গেলাসে পান করি,
এই ঘাসের শরীর ছানি — চোখে চোখ ঘষি,
ঘাসের পাখনায় আমার পালক,
ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার
শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে।

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯—১৯৫৪) : জন্ম অধুনা বাংলাদেশের বরিশালে। রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি। পড়াশুনো প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে পড়িয়েছেন একাধিক কলেজে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরা পালক' ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে - 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'বনলতা সেন', 'মহাপৃথিবী', 'সাতটি তারার তিমির', 'রূপসী বাংলা', 'বেলা অবেলা কালবেলা' প্রভৃতি। তাঁর রচিত আখ্যানের মধ্যে রয়েছে — 'কারুবাসনা', 'বাসমতীর উপাখ্যান', 'মাল্যবান', 'সুতীর্থ', 'জলপাইহাটি' প্রভৃতি। 'কবিতার কথা' তাঁর লেখা একমাত্র প্রবন্ধগ্রন্থ।

মানুষের ধর্ম

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মানবদেহে বহুকোটি জীবকোশ; তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র জন্ম, স্বতন্ত্র মরণ। অণুবীক্ষণযোগে জানা যায়, তাদের প্রত্যেকের চারিদিকে ফাঁক। একদিকে এই জীবকোশগুলি আপন আপন পৃথক জীবনে জীবিত, আর -একদিকে তাদের মধ্যে একটি গভীর নির্দেশ আছে, প্রেরণা আছে, একটি ঐক্যতত্ত্ব আছে, সেটি অগোচর পদার্থ ; সেই প্রেরণা সমগ্র দেহের দিকে, সেই ঐক্য সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত। মনে করা যেতে পারে, সেই সমগ্র দেহের উপলব্ধি অসংখ্য জীবকোশের অগম্য, অথচ সেই দেহের পরম রহস্যময় আহ্বান তাদের প্রত্যেকের কাছে দাবি করছে তাদের আত্মনিবেদন। যেখানে তারা প্রত্যেকে নিজেরই স্বতন্ত্র জীবনসীমায় বর্তমান সেখানে তার মধ্যে রহস্য কিছুই নেই। কিন্তু, যেখানে তারা নিজের জীবনসীমাকে অতিক্রম করে সমস্ত দেহের জীবনে সত্য সেখানে তারা আশ্চর্য, সেখানে তারা আপন স্বতন্ত্র জন্মমৃত্যুর মধ্যে বদ্ধ নয়। সেইখানেই তাদের সার্থকতা।

শোনা যায়, প্রতি সাত বছর অন্তর মানুষের দেহে এই জীবকোশগুলির পরিবর্তন ঘটে। তারা বিদায় নেয়, অর্থাৎ তাদের পৃথক সত্তা থাকে না। কিন্তু তাদের মধ্যে যে সত্তা সমস্ত দেহের আয়ুর অন্তর্গত, অর্থাৎ যেটা তাদের স্বদৈহিক নয়, বিশ্বদৈহিক, সেই সত্তা সমস্ত দেহের জীবনপ্রবাহে থেকে যায়।

দেহে কখনো কখনো কর্কটরোগ অর্থাৎ ক্যান্সার জন্মায় ; সেই ক্যান্সার একান্তই স্বতন্ত্র, বলা যেতে পারে তার মধ্যে দেহাত্মবোধ নেই। সমগ্র দেহের সে প্রতিকূল। দেহের পক্ষে একেই বলা যায় অশুভ।

মানুষের দেহের জীবকোশগুলির যদি আত্মবোধ থাকত তা হলে একদিকে তারা ক্ষুদ্রভাবে আপনাদেরকে স্বতন্ত্র জানত, আবার বৃহৎভাবে নিজেদেরকে জানত সমগ্র দেহে। কিন্তু জানত অনুভবে, কল্পনায়; সমগ্র দেহকে প্রত্যক্ষত ও সম্পূর্ণত জানা সম্ভব হতো না। কেননা এই দেহ শুধু যে বর্তমানে অধিষ্ঠিত তা নয়, এই দেহে রয়েছে তার অতীত, অপেক্ষা করছে তার ভবিষ্যৎ। আরো একটা প্রত্যক্ষাতীত পদার্থ রয়েছে যা সর্বদেহব্যাপী কল্যাণ, যাকে বলি স্বাস্থ্য, যাকে বিশ্লেষণ করা যায় না। তাছাড়া সমগ্র জীবনরক্ষার গভীরতর চেষ্টা প্রত্যেক জীবকোশের আছে, যে চেষ্টা রোগের অবস্থায় সর্বদেহের শত্রুহননে নিজেদের আত্মহানি ও ঘটায়, দেশপ্রেমিক যেমন করে দেশের জন্যে প্রাণ দেয়। এই চেষ্টার রহস্য অনুসরণ করলেই বোঝা যেতে পারে, এই ক্ষুদ্র দেহগুলির চরম লক্ষ্য অর্থাৎ পরম ধর্ম এমন-কিছুকে আশ্রয় করে যাকে বলব তাদের বিশ্বদেহ।

মানুষও আপন অন্তরের গভীরতর চেষ্টার প্রতি লক্ষ করে অনুভব করেছে যে, সে শুধু ব্যক্তিগত মানুষ নয়, সে বিশ্বগত মানুষের একাত্ম। সেই বিরাট মানব 'অবিভক্ত ঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্'। সেই বিশ্বমানবের প্রেরণায় ব্যক্তিগত মানুষ এমন-সকল কাজে প্রবৃত্ত হয় যা তার ভৌতিক সীমা অতিক্রমণের মুখে। যাকে সে বলে ভালো, বলে সুন্দর, বলে শ্রেষ্ঠ ; কেবল সমাজরক্ষার দিক থেকে নয়, আপন আত্মার পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তির দিক থেকে।

ডিমের ভিতরে যে পাখির ছানা আছে তার অঙ্গে দেখতে পাই ডানার সূচনা। ডিমে-বাঁধা জীবনে সেই ডানার কোনো অর্থই নেই। সেখানে আছে ডানার অবিচলিত প্রতিবাদ। এই অপরিণত ডানার সংকেত জানিয়ে দেয়, ডিমের বাইরে সত্যের যে পূর্ণতা আজও তার কাছে অপ্রত্যক্ষ সেই মুক্ত সত্যে সঞ্চরণেই পাখির সার্থকতা। তেমনিই মানুষের চিত্তবৃত্তির যে ঔৎসুক্য মানুষের পূর্ণ সত্যের সাক্ষ্য দেয় সেইখানেই অনুভব করি তার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য থেকে মুক্তি। সেইখানে সে বিশ্বাভিমুখী।

জীবকে কল্পনা করা যাক, সে যেন জীবনযাত্রার একটা রেলগাড়ির মধ্যেই জন্মায়, বেঁচে থাকে এবং মরে। এই গাড়ি সংকীর্ণ লক্ষ্যপথে বাঁধা রাস্তায় চলে। জন্তুর মাথাটা গাড়ির নিম্নতলের সমরেখায়। গাড়ির সীমার মধ্যে তার আহার-বিহারের সন্ধান চলছে নীচের দিকে ঝুঁকে। ওইটুকুর মধ্যে বাধাবিপত্তি যথেষ্ট, তাই নিয়ে দিন কাটে। মানুষের মতো সে মাথা তুলে উঠে দাঁড়াতে পারে না। উপরের জানলা পর্যন্ত পৌঁছয় না তার দৃষ্টি, তার মনের গতি নেই প্রাণধারণের বাইরে।

মানুষ খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। সামনে পেয়েছে জানলা। জানতে পেরেছে, গাড়ির মধ্যেই সব-কিছু বদ্ধ নয়। তার বাইরে দিগন্তের পর দিগন্ত। জীবনের আশু লক্ষ্যপথ উত্তীর্ণ হয়েও যা বাকি আছে তার আভাস পাওয়া যায়, সীমা দেখা যায় না। যেটুকু আলো গাড়ির প্রয়োজনের পক্ষে যথোপযুক্ত, বাইরে তারই বিস্তার অবাধ অজস্র। সেই আলো তাকে ডাকে কেন। ওই প্রয়োজনাতীত বাইরেটার প্রতি উদাসীন থাকলে ক্ষতি কী ছিল। দিন তো চলে যেত, যেমন চলছে হাজারলক্ষ প্রাণীর। কিন্তু, মানুষকে অস্থির করে তুললে যে। বললে, তাকে ছাড়া পেতে হবে সেইখানেই যেখানে তার প্রয়োজন নেই, যার পরিচয় তার কাছে আজও অসম্পূর্ণ। প্রাণশক্তির অতিনির্দিষ্ট সাম্রাজ্যপ্রাচীর লঙ্ঘন করে সে জয় করতে বেরল আপন স্বরাজ। এই জয়যাত্রার পথে

তার সহজ প্রবৃত্তি তার পক্ষ নেয় না, এই পথে তার আরাম নেই, তার বিশ্রাম নেই ; শত শত যাত্রী প্রাণ দিয়ে এই পথকে কেবলই প্রশস্ত করছে, উন্মুক্ত করছে।

দেহের দিকে মানুষকে বিচার করে দেখা যাক। সে উঠে দাঁড়িয়েছে। এমন কথা বলা চলে না যে, দাঁড়াবে না তো কী। দাঁড়ানো সহজ নয়। পাখির দেহের ছন্দটা দ্বিপদী। মানুষের দেহটা চতুষ্পদ জীবের প্রশস্ত ছন্দে বানানো। চার পায়ের উপর লম্বা দেহের ওজন সামনে পিছনে ভাগ করে করে দিলেই এমনতরো দেহটাকে একসঙ্গে বহন ও সঞ্চালন তার পক্ষে সহজ হতে পারত। কিন্তু, মানুষ আপন দেহের স্বভাবকে মানতে চাইলে না, এজন্যে সে অসুবিধে সইতেও রাজি। চলমান দীর্ঘ দেহটার ভাররক্ষার সাধনা করলে ওই দুই পায়ের উপরেই । সেটা সহজসাধ্য নয়, ছেলেদের প্রথম চলার অভ্যাস দেখলেই তা বোঝা যায়। শেষবয়সে বৃদ্ধকে লাঠির উপর ভর দিতে হয়, সেও একটা প্রমাণ। এও দেখা যায়, চারপেয়ে জন্তু যত সহজে ভার বহন করতে পারে মানুষ তা পারে না — এইজন্যেই অন্যের পরে নিজের বোঝা চাপাবার নানা কৌশল মানুষের অভ্যস্ত। সেই সুযোগ পেয়েছে বলেই যত পেরেছে ভার সৃষ্টি করেছে। তাকে পরিমিত করবার চেষ্টা নেই। মানুষের এই চালটা যে সহজ নয় তার দৃষ্টান্ত প্রায়ই পাওয়া যায়। ধাক্কা খেয়ে মানুষের অঙ্গহানি বা গাম্ভীর্যহানির যে আশঙ্কা, জন্তুদের সেটা নেই। শুধু তাই নয়, ডাক্তারের কাছে শোনা যায় মানুষ উত্ততভঙ্গী নিয়েছে বলে তার আদিম অবতত দেহের অনেক যন্ত্রকে রোগদুঃখ ভোগ করতে হয়। তবু মানুষ স্পর্ধা করে উঠে দাঁড়াল।

নীচের দিকে ঝুঁকে পড়ে জন্তু দেখতে প্রায় খণ্ড খণ্ড বস্তুকে। তার দেখার সঙ্গে তার ঘ্রাণ দেয় যোগ। চোখের দেখাটা অপেক্ষাকৃত অনাসক্ত, জ্ঞানের রাজ্যে তার প্রভাব বেশি। ঘ্রাণের অনুভূতি দেহবৃত্তির সংকীর্ণ সীমায়। দেখা ও ঘ্রাণ নিয়ে জন্তুরা বস্তুর যে পরিচয় পায় সে পরিচয় বিশেষভাবে আশু প্রয়োজনের । উপরে মাথা তুলে মানুষ দেখলে কেবল বস্তুকে নয়, দেখলে দৃশ্যকে অর্থাৎ বিচিত্র বস্তুর ঐক্যকে। একটি অখণ্ড বিস্তারের কেন্দ্রস্থলে দেখলে নিজেকে। একে বলা যায় মুক্তদৃষ্টি। খাড়া-হওয়া মানুষের কাছে নিকটের চেয়ে দূরের দাম বেশি। অজ্ঞাত-অভাবনীয়ের দিকে তার মন হয়েছে প্রবৃত্ত। এই দৃষ্টির সঙ্গে যোগ দিয়েছে অন্তরের কল্পনাদৃষ্টি। শুধু দৃষ্টি নয় সঙ্গে সঙ্গে দুটো হাতও পেয়েছে মুক্তি। পায়ের কাজ থেকে হাত যদি ছুটি না পেত তা হলে সে থাকত দেহেরই একান্ত অনুগত।

...মানুষের কল্পনাবৃত্তি হাতকে পেয়ে বসল। দেহের জরুরি কাজগুলো সেরে দিয়েই সে লেগে গেল নানা বাজে কাজে। জীবনযাত্রার কর্মব্যবস্থায় সে Whole-time কর্মচারী রইল না। সে লাগল অভাবিতের পরীক্ষায়, অচিন্ত্যপূর্বের রচনায় — অনেকটাই অনাবশ্যক। মানুষের ঋজু মুক্ত দেহ মাটির নিকটস্থ টান ছাড়িয়ে যেতেই তার মন এমন একটা বিরাট রাজ্যের পরিচয় পেলে যা অন্নব্রহ্মের নয়, যাকে বলা যায় বিজ্ঞানব্রহ্মের আনন্দব্রহ্মের রাজ্য। এ রাজ্যে মানুষ যে কাজগুলো করে হিসাবি লোক জিজ্ঞাসা করতে পারে, 'এ-সব কেন।' একমাত্র তার উত্তর, 'আমার খুশি।' তার বিজ্ঞানে, তার সাহিত্যে, তার শিল্প-কলায় এই এক উত্তর, 'আমার খুশি'। মাথাতোলা মানুষের এতবড়ো গর্ব। জন্তুদেরও যথেচ্ছ খেলার অবকাশ আছে, কিন্তু জীবনে তাদের খেলাটা গৌণ। তা ছাড়া তাদের খেলাও প্রকৃতির অনুগত। বিড়ালছানার খেলা মিথ্যা ইঁদুর মিছামিছি ধরা, কুকুরছানার খেলা নিজের লেজের সঙ্গে লড়াই করার সগর্জন ভান। কিন্তু, মানুষের যে কাজটাকে লীলা বলা যায় অর্থাৎ যা তার কোনো দরকারের আমলে আসে না, কথায় কথায় সেইটেই হয়ে ওঠে মুখ্য, ছাড়িয়ে যায় তার প্রাণযাত্রাকে। সেইটের দ্বারাই তার শ্রেষ্ঠতার পরিচয়। অবকাশের ভূমিকায় মানুষ সর্বত্রই আপন অমরাবতী রচনায় ব্যস্ত, সেখানে তার

আকাশকুসুমের কুঞ্জবন। এই-সব কাজে সে এত গৌরব বোধ করে যে চাষের ক্ষেতে তার অবজ্ঞা। আধুনিক বাংলাভাষায় সে যাকে একটা কুশ্রাব্য নাম দিয়েছে কৃষ্টি, হাল-লাঙলের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই এবং গোরুকে তার বাহন বললে ব্যঙ্গ করা হয়। বলা বাহুল্য, দূরতম তারায় মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন, সেই তারার যে আলোকরশ্মি চার-পাঁচ হাজার এবং ততোধিক বৎসর ধরে ব্যোমবিহারী গৃহত্যাগী, তারই দৌড় মাপতে মানুষের দিন যায়, তার রাত কাটে। তাছাড়া মানুষ অকারণে কথার সঙ্গে কথার বিনুনি করে কবিতাও লেখে ; এমন-কি, যারা আধপেটা খেয়ে কৃশতনু তারাও বাহবা দেয়। এর থেকেই আন্দাজ করি, মানুষের অন্নের ক্ষেত প্রকৃতির এলেকায় থাকতে পারে, দেহের দ্বারে পেয়াদার তাগিদে তার খাজনাও দিতে হয়, কিন্তু যেখানে মানুষের বাস্তুভিটে সেই লাখেরাজ দেবত্রভূমি প্রকৃতির এলেকার বাইরে। সেখানে জোর-তলবের দায় নেই, সেখানে সকলের চেয়ে বড়ো দায়িত্ব, স্বাধীন দায়িত্ব, তাকে বলব আদর্শের দায়িত্ব, মনুষ্যত্বের দায়িত্ব।

দেহের দিক থেকে মানুষ যেমন ঊর্ধ্বশিরে নিজেকে টেনে তুলেছে খণ্ডভূমির থেকে বিশ্বভূমির দিকে, নিজের জানাশোনাকেও তেমনি স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে জৈবিক প্রয়োজন থেকে, ব্যক্তিগত অভিরুচির থেকে। জ্ঞানের এই সম্মানে মানুষের বৈষয়িক লাভ হোক বা না হোক, আনন্দ লাভ হলো। এইটেই বিস্ময়ের কথা। পেট না ভরিয়েও কেন হয় আনন্দ। বিষয়কে বড়ো করে পায় বলে আনন্দ নয়, আপনাকেই বড়ো করে সত্য করে পায় বলে আনন্দ। মানবজীবনের যে বিভাগ অহৈতুক অনুরাগের অর্থাৎ আপনার বাহিরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগের, তার পুরস্কার আপনারই মধ্যে। কারণ, সেই যোগের প্রসারেই আত্মার সত্য।

(সম্পাদিত)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১) : জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে। অল্পবয়স থেকেই ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত ভারতী ও বালক পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। দীর্ঘ জীবনে অজস্র কবিতা, গান, ছোটোগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক লিখেছেন, ছবি এঁকেছেন। এশিয়ার মধ্যে তিনিই প্রথম নোবেল পুরস্কার পান ১৯১৩ সালে 'Song Offerings' এর জন্য। দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত ও বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত তাঁর রচনা। তিনি সাহিত্য সম্বন্ধে যে প্রবন্ধগ্রন্থগুলি রচনা করেছিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'প্রাচীন সাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য', 'সাহিত্য', 'লোকসাহিত্য'। 'সাহিত্যের স্বরূপ' নামক পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয় কবির মৃত্যুর পরে। সাহিত্য সমালোচনা ছাড়া ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, ছন্দ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি 'শব্দতত্ত্ব', 'ছন্দ', 'বংলাভাষা পরিচয়' প্রভৃতি গ্রন্থ লিখেছেন। 'ধর্ম', 'শান্তিনিকেতন' প্রভৃতি গ্রন্থে কবির ধর্মজিজ্ঞাসা স্থান পেয়েছে। ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি ও শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধগুলি হলো 'আত্মশক্তি', 'ভারতবর্ষ', 'শিক্ষা', 'রাজাপ্রজা', 'স্বদেশ', 'পরিচয়', 'কালান্তর', 'সভ্যতার সঙ্কট' প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথ অজস্র স্মৃতিকথা, চিঠি, দিনলিপি লেখেন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য: 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র', 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি', 'জীবনস্মৃতি', 'জাপানযাত্রী', 'জাভাযাত্রীর পত্র', 'রাশিয়ার চিঠি', 'পথের সঞ্চয়', 'ছেলেবেলা', 'আত্মপরিচয়', 'ছিন্নপত্র' এবং বহুখণ্ডে সঙ্কলিত 'চিঠিপত্র'।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান

রাজশেখর বসু

যাদের জন্য বিজ্ঞান বিষয়ক বাংলা গ্রন্থ বা প্রবন্ধ লেখা হয় তাদের মোটামুটি দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম, যারা ইংরেজি জানে না বা অতি অল্প জানে। অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়ে এবং অল্পশিক্ষিত বয়স্ক লোক এই শ্রেণিতে পড়ে। দ্বিতীয়, যারা ইংরেজি জানে এবং ইংরেজি ভাষায় অল্পাধিক বিজ্ঞান পড়েছে।

প্রথম শ্রেণির পাঠকদের বিজ্ঞানের সঙ্গে পূর্ব পরিচয় নেই। গুটিকতক ইংরেজি পারিভাষিক শব্দ হয়তো তারা শিখেছে, যেমন টাইফয়েড, আয়োডিন, মোটর, ক্রোটন, জেব্রা। অনেক রকম স্থূল তথ্যও তাদের জানা থাকতে পারে, যেমন জল আর কর্পূর উবে যায়, পিতলের চাইতে আলিউমিনিয়াম হালকা, লাউ, কুমড়ো জাতীয় গাছে দুরকম ফুল হয়। এই রকম সামান্য জ্ঞান থাকলেও সুশৃঙ্খল আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্য তারা কিছুই জানে না। এই শ্রেণির পাঠক ইংরেজি ভাষার প্রভাব থেকে মুক্ত, সেজন্য বাংলা পরিভাষা আয়ত্ত করে বাংলায় বিজ্ঞান শেখা তাদের সংস্কারের বিরোধী নয়। ছেলেবেলায় আমাকে ব্রহ্মমোহন মল্লিকের বাংলা জ্যামিতি পড়তে হয়েছিল। 'এক নির্দিষ্ট সীমাবিশিষ্ট সরল রেখার উপর এক সমবাহু ত্রিভুজ অঙ্কিত করিতে হইবে'—এর মানে বুঝতে বাধা হয়নি, কারণ ভাষাগত বিরোধী সংস্কার ছিল না। কিন্তু যারা ইংরেজি জিওমেট্রি পড়েছে তাদের কাছে উক্ত প্রতিজ্ঞাবাক্যটি সুশ্রাব্য ঠেকবে না, তার মানেও স্পষ্ট হবে না। যে লোক আজন্ম ইজার পরেছে তার পক্ষে হঠাৎ ধুতি পরা অভ্যাস করা একটু শক্ত। আমাদের সরকার ক্রমে ক্রমে রাজকার্যে দেশি পরিভাষা চালাচ্ছেন, তাতে অনেকে মুশকিলে পড়েছেন, কারণ তাঁদের নূতন করে শিখতে হচ্ছে।

পূর্বোক্ত প্রথম শ্রেণির পাঠক যখন বাংলায় বিজ্ঞান শেখে তখন ভাষার জন্য তার বাধা হয় না, শুধু বিষয়টি যত্ন করে বুঝতে হয়। পাশ্চাত্ত্য দেশের শিক্ষার্থীর চেয়ে তাকে বেশি চেষ্টা করতে হয় না। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠক যখন বাংলা ভাষায় লেখা বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ পড়ে তখন তাকে পূর্ব সংস্কার দমন করে (অর্থাৎ ইংরেজির প্রতি অতিরিক্ত পক্ষপাত বর্জন করে) প্রীতির সহিত মাতৃভাষার পদ্ধতি আয়ত্ত করতে হয়। এই কারণে পাশ্চাত্য পাঠকের তুলনায় তার পক্ষে একটু বেশি চেষ্টা আবশ্যক।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চায় এখনও নানা রকম বাধা আছে। বাংলা পারিভাষিক শব্দ প্রচুর নেই। অনেক বৎসর পূর্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী লেখক নানা বিষয়ের পরিভাষা রচনা করেছিলেন। তাঁদের উদ্‌যোগের এই ত্রুটি ছিল যে তাঁরা একযোগে কাজ না করে স্বতন্ত্রভাবে করেছিলেন, তার ফলে সংকলিত পরিভাষার সাম্য হয়নি, একই ইংরেজি সংজ্ঞার বিভিন্ন প্রতিশব্দ রচিত হয়েছে। ১৯৩৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে পরিভাষাসমিতি নিযুক্ত করেছিলেন তাতে বিভিন্ন বিজ্ঞানের অধ্যাপক, ভাষাতত্ত্বজ্ঞ, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং কয়েকজন লেখক একযোগে কাজ করেছিলেন, তার ফলে তাঁদের চেষ্টা অধিকতর সফল হয়েছে।

পরিভাষা রচনা একজনের কাজ নয়, সমবেতভাবে না করলে নানা ত্রুটি হতে পারে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকলন খুব বড়ো নয়, আরও শব্দের প্রয়োজন আছে এবং তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা আবশ্যক। কিন্তু দরকার মতন বাংলা শব্দ পাওয়া না গেলেও বৈজ্ঞানিক রচনা চলতে পারে। যতদিন উপযুক্ত ও প্রামাণিক বাংলা শব্দ রচিত না হয় ততদিন ইংরেজি শব্দই বাংলা বানানে চালানো ভালো। বিশ্ববিদ্যালয়-নিযুক্ত সমিতি বিস্তর ইংরেজি শব্দ বজায় রেখেছেন। তাঁরা বিধান দিয়েছেন যে নবাগত রাসায়নিক বস্তুর ইংরেজি নামই বাংলা বানানে চলবে, যেমন অক্সিজেন, প্যারাডাইক্লোরোবেনজিন। উদ্ভিদ ও প্রাণীর জাতিবাচক বা পরিচয়বাচক অধিকাংশ ইংরেজি (বা সার্বজাতিক, international) নামও বাংলায় চালানো যেতে পারে, যেমন ম্যালভাসি, ফার্ন, আরথ্রোপোডা ইনসেক্টা।

পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় এদেশের জনসাধারণের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নগণ্য। প্রাথমিক বিজ্ঞানের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয় না থাকলেও কোনো বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ বোঝা কঠিন। ইওরোপ আমেরিকায় পপুলার সায়েন্স লেখা সুসাধ্য এবং সাধারণে তা সহজেই বোঝে। কিন্তু আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থা তেমন নয়, বয়স্কদের জন্য যা লেখা হয় তাও প্রাথমিক বিজ্ঞানের মতন গোড়া থেকে না লিখলে বোধগম্য হয় না। জনসাধারণের জন্য যাঁরা বাংলায় বিজ্ঞান লেখেন তাঁরা এ বিষয়ে অবহিত না হলে তাঁদের লেখা জনপ্রিয় হবে না। অবশ্য কালক্রমে এ দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার বিস্তার হলে এই অসুবিধা দূর হবে, তখন বৈজ্ঞানিক সাহিত্য রচনা সুসাধ্য হবে।

বিজ্ঞান আলোচনার জন্য যে রচনাপদ্ধতি আবশ্যক তা অনেক লেখক এখনও আয়ত্ত করতে পারেননি, অনেক স্থলে তাঁদের ভাষা আড়ষ্ট এবং ইংরেজির আক্ষরিক অনুবাদ হয়ে পড়ে। এই দোষ থেকে মুক্ত না হলে বাংলা বৈজ্ঞানিক সাহিত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না। অনেক লেখক মনে করেন, ইংরেজি শব্দের যে অর্থব্যাপ্তি বা connotation, বাংলা প্রতিশব্দেরও ঠিক তাই হওয়া চাই, এজন্য অনেক সময় তাঁরা অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ প্রয়োগ করেন। ইংরেজি sensitive শব্দ নানা অর্থে চলে, যেমন sensitive person, wound, plant, balance, photographic paper ইত্যাদি। বাংলায় অর্থভেদে বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করাই উচিত, যেমন অভিমানী, ব্যথাপ্রবণ, উত্তেজী, সুবেদী, সুগ্রাহী। Sensitized paper-এর অনুবাদ স্পর্শকাতর কাগজ অতি উৎকট, কিন্তু তাও কেউ কেউ লিখে থাকেন। সুগ্রাহী কাগজ লিখলে ঠিক হয়।

অনেক লেখক তাঁদের বক্তব্য ইংরেজিতে ভাবেন এবং যথাযথ বাংলা অনুবাদে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেন। এতে রচনা উৎকট হয়। The atomic engine has not even reached the blue print stage , —'পরমাণু এঞ্জিন নীল চিত্রের অবস্থাতেও পৌঁছায়নি।' এ রকম বর্ণনা বাংলা ভাষায় প্রকৃতিবিরুদ্ধ। একটু ঘুরিয়ে লিখলে অর্থ সরল হয়—পরমাণু এঞ্জিনের নকশা পর্যন্ত এখনও প্রস্তুত হয়নি। When sulphur burns in air the nitrogen does not take part in the reaction — 'যখন গন্ধক হাওয়ায় পোড়ে তখন নাইট্রোজেন প্রতিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে না।' এ রকম মাছিমারা নকল না করে 'নাইট্রোজেনের কোনো পরিবর্তন হয় না' লিখলে বাংলা ভাষা বজায় থাকে।

অনেকে মনে করেন পারিভাষিক শব্দ বাদ দিয়ে বক্তব্য প্রকাশ করলে রচনা সহজ হয়। এই ধারণা পুরোপুরি ঠিক নয়। স্থান বিশেষে পারিভাষিক শব্দ বাদ দেওয়া চলে, যেমন 'অমেরুদণ্ডী'র বদলে লেখা যেতে পারে, যেসব জন্তুর শিরদাঁড়া নেই। কিন্তু 'আলোকতরঙ্গ'র বদলে আলোর কাঁপন বা নাচন লিখলে কিছু মাত্র সহজ হয় না। পরিভাষার উদ্দেশ্য ভাষার সংক্ষেপ এবং অর্থ সুনির্দিষ্ট করা। যদি বার বার কোনো বিষয়ের বর্ণনা দিতে হয় তবে অনর্থক কথা বেড়ে যায়, তাতে পাঠকের অসুবিধা হয়। সাধারণের জন্য যে বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ লেখা হয় তাতে অল্প পরিচিত পারিভাষিক শব্দের প্রথমবার প্রয়োগের সময় তার ব্যাখ্যা (এবং স্থলবিশেষে ইংরেজি নাম) দেওয়া আবশ্যক, কিন্তু পরে শুধু বাংলা পারিভাষিক শব্দটি দিলেই চলে।

আমাদের আলংকারিকগণ শব্দের ত্রিবিধ কথা বলেছেন — অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা। প্রথমটি শুধু আভিধানিক অর্থ প্রকাশ করে, যেমন 'দেশ'এর অর্থ ভারত ইত্যাদি, অথবা স্থান। কিন্তু 'দেশের লজ্জা'—এখানে লক্ষণীয় দেশের অর্থ দেশবাসীর। 'অরণ্য'এর আভিধানিক অর্থ বন, কিন্তু 'অরণ্যে রোদন' বললে ব্যঞ্জনার অর্থ হয় নিষ্ফল খেদ। সাধারণ সাহিত্যে লক্ষণা বা ব্যঞ্জনা এবং উৎপ্রেক্ষা অতিশয়োক্তি প্রভৃতি অলংকারের সার্থক প্রয়োগ হতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে যত কম থাকে ততই ভালো। উপমার কিছু প্রয়োজন হয়, রূপকও স্থলবিশেষে চলতে পারে, কিন্তু অন্যান্য অলংকার বর্জন করাই উচিত। 'হিমালয় যেন পৃথিবীর মানদণ্ড'—কালিদাসের এই উক্তি কাব্যেরই উপযুক্ত, ভূগোলের নয়। বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গের ভাষা অত্যন্ত সরল ও স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক—এই কথাটি সকল লেখকেরই মনে রাখা উচিত।

বাংলা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদিতে আর একটি দোষ প্রায় নজরে পড়ে। অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী এই প্রবাদটি যে কত ঠিক তার প্রমাণ আমাদের সাময়িকপত্রাদিতে মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। কিছুদিন আগে একটি পত্রিকায় দেখেছি—'অক্সিজেন বা হাইড্রোজেন স্বাস্থ্যকর বলে বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই। তারা জীবের বেঁচে থাকবার পক্ষে অপরিহার্য অঙ্গ মাত্র। তবে ওজন গ্যাস স্বাস্থ্যকর।' এই রকম ভুল লেখা সাধারণ পাঠকের পক্ষে অনিষ্টকর। সম্পাদকের উচিত অবিখ্যাত লেখকের বৈজ্ঞানিক রচনা প্রকাশের আগে অভিজ্ঞ লোককে দিয়ে যাচাই করে নেওয়া।

রাজশেখর বসু (১৮৮০—১৯৬০) : জন্ম নদিয়া জেলার বীরনগরে। পিতা দার্শনিক পণ্ডিত চন্দ্রশেখর বসু দ্বারভাঙ্গা রাজ এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে 'পরশুরাম' ছদ্মনামে রসরচনার জন্য রাজশেখর বসু চিরস্মরণীয়। 'গড্ডলিকা', 'কজ্জলী', 'হনুমানের স্বপ্ন' প্রভৃতি রসরচনার তিনি অনন্য স্রষ্টা। তাঁর লেখা প্রবন্ধগ্রন্থ গুলির মধ্যে রয়েছে : 'লঘুগুরু', 'বিচিন্তা', 'ভারতের খনিজ', 'কুটির শিল্প' ইত্যাদি। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি 'চলন্তিকা' বাংলা অভিধান প্রকাশিত হয়। তিনি 'বাল্মীকি রামায়ণ', 'মহাভারত', 'মেঘদূত', 'হিতোপদেশের গল্প' অনুবাদ করেন। তিনি 'রবীন্দ্র পুরস্কার', 'অকাদেমি পুরস্কার' লাভ করেন এবং 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হন। কলকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে 'ডক্টরেট' উপাধি প্রদান করেন।

অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান

জয় গোস্বামী

অস্ত্র ফ্যালো, অস্ত্র রাখো পায়ে
আমি এখন হাজার হাতে পায়ে
এগিয়ে আসি, উঠে দাঁড়াই
হাত নাড়িয়ে বুলেট তাড়াই
গানের বর্ম আজ পরেছি গায়ে

গান তো জানি একটা দুটো
আঁকড়ে ধরে সে-খড়কুটো
রক্ত মুছি শুধু গানের গায়ে
মাথায় কত শকুন বা চিল
আমার শুধু একটা কোকিল
গান বাঁধবে সহস্র উপায়ে

অস্ত্র রাখো, অস্ত্র ফ্যালো পায়ে
বর্ম খুলে দ্যাখো আদুড় গায়ে
গান দাঁড়াল ঋষিবালক
মাথায় গোঁজা ময়ূরপালক
তোমায় নিয়ে বেড়াবে গান
নদীতে, দেশগাঁয়ে
অস্ত্র ফ্যালো, অস্ত্র রাখো গানের দুটি পায়ে...

জয় গোস্বামী : জন্ম ১৯৫৪, কলকাতায়। বাংলা সাহিত্যের এক খ্যাতিমান কবি। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য কবিতার বই 'প্রত্নজীব', 'উন্মাদের পাঠক্রম', 'ভুতুমভগবান', 'ঘুমিয়েছ ঝাউপাতা?', 'বজ্রবিদ্যুৎভর্তি খাতা', 'পাগলী তোমার সঙ্গে', 'সূর্য পোড়া ছাই', 'হরিণের জন্য একক', 'ভালোটি বাসিব', 'হার্মাদ শিবির', 'গরাদ! গরাদ!' প্রভৃতি। 'যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল' তাঁর স্মরণীয় কাব্য-উপন্যাস। তাঁর রচিত বিখ্যাত উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে 'সেই সব শেয়ালেরা', 'সুড়ঙ্গ ও প্রতিরক্ষা' প্রভৃতি। বাংলা কবিতার আলোচনায় তাঁর লেখা 'আকস্মিকের খেলা', 'আমার রবীন্দ্রনাথ', 'গোঁসাইবাগান (তিন খণ্ড)' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। সাহিত্যকৃতির জন্য তিনি আনন্দ পুরস্কার, সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার সহ বহুবিধ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন।

নদীর বিদ্রোহ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

চারটা পঁয়তাল্লিশের প্যাসেঞ্জার ট্রেনটিকে রওনা করাইয়া দিয়া নদেরচাঁদ নূতন সহকারীকে ডাকিয়া বলিল, আমি চললাম হে!

নূতন সহকারী একবার মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

নদেরচাঁদ বলিল, আর বৃষ্টি হবে না, কী বলো?

নূতন সহকারী একবার জলে জলময় পৃথিবীর দিকে চাহিয়া বলিল, আজ্ঞে না।

নদেরচাঁদ লাইন ধরিয়া এক মাইল দূরে নদীর উপরকার ব্রিজের দিকে হাঁটিতে লাগিল। পাঁচদিন অবিরত বৃষ্টি হইয়া আজ এই বিকালের দিকে বর্ষণ থামিয়াছে। পাঁচদিন নদীকে দেখা হয় নাই। নদেরচাঁদ ছেলেমানুষের মতো ঔৎসুক্য বোধ করিতে লাগিল। আকাশে যেমন মেঘ করিয়া আছে, হয়তো আবার কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রবল ধারায় বর্ষণ শুরু হইয়া যাইবে। তা হোক। ব্রিজের একপাশে আজ চুপচাপ বসিয়া কিছুক্ষণ নদীকে না দেখিলে সে বাঁচিবে না। পাঁচদিনের আকাশ ভাঙা বৃষ্টি না জানি নদীকে আজ কী অপরূপ রূপ দিয়াছে? দুদিকে মাঠঘাট জলে ডুবিয়া গিয়াছিল, রেলের উঁচু বাঁধ ধরিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে দুপাশে চাহিয়া চাহিয়া নদেরচাঁদ নদীর বর্ষণ-পুষ্ট মূর্তি কল্পনা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ত্রিশ বছর বয়সে নদীর জন্য নদেরচাঁদের এত বেশি মায়া একটু অস্বাভাবিক। কেবল বয়সের জন্য নয়, ছোটো হোক, তুচ্ছ হোক, সে তো একটা স্টেশনের স্টেশন মাস্টার, দিবারাত্রি মেল, প্যাসেঞ্জার আর মালগাড়িগুলির তীব্রবেগে ছুটাছুটি নিয়ন্ত্রিত করিবার দায়িত্ব যাহাদের সেও তো তাহাদেরই একজন, নদীর জন্য এমনভাবে পাগলা হওয়া কি তার সাজে? নদেরচাঁদ সব বোঝে, নিজেকে কেবল বুঝাইতে পারে না। নিজের এই পাগলামিতে যেন আনন্দই উপভোগ করে।

অস্বাভাবিক হোক, নদীকে এভাবে ভালোবাসিবার একটা কৈফিয়ত নদেরচাঁদ দিতে পারে। নদীর ধারে তার জন্ম হইয়াছে, নদীর ধারে সে মানুষ হইয়াছে, চিরদিন নদীকে সে ভালোবাসিয়াছে। দেশের নদীটি তার হয়তো এই নদীর মতো এত বড়ো ছিল না, কিন্তু শৈশবে, কৈশোরে, আর প্রথম যৌবনে বড়োছোটোর হিসাব কে করে? দেশের সেই ক্ষীণস্রোতা নির্জীব নদীটি অসুস্থ দুর্বল আত্মীয়ার মতোই তার মমতা পাইয়াছিল। বড়ো হইয়া একবার অনাবৃষ্টির বছরে নদীর ক্ষীণ স্রোতধারাও প্রায় শুকাইয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছে দেখিয়া সে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল; দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগিতে ভুগিতে পরমাত্মীয়া মরিয়া যাওয়ার উপক্রম করিলে মানুষ যেমন কাঁদে।

ব্রিজের কাছাকাছি আসিয়া প্রথমবার নদীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই নদেরচাঁদ স্তম্ভিত হইয়া গেল। পাঁচদিন আগেও বর্ষার জলে পরিপুষ্ট নদীর পঙ্কিল জলস্রোতে সে চাঞ্চল্য দেখিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে চাঞ্চল্য যেন ছিল পরিপূর্ণতার আনন্দের প্রকাশ। আজ যেন সেই নদী খেপিয়া গিয়াছে, গাঢ়তর পঙ্কিল জল ফুলিয়া ফাঁপিয়া ফেনোচ্ছ্বাসিত হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। এতক্ষণ নদেরচাঁদ একটি সংকীর্ণ ক্ষীণস্রোতা নদীর কথা ভাবিতেছিল। তার চার বছরের চেনা এই নদীর মূর্তিকে তাই যেন আরও বেশি ভয়ংকর, আরও বেশি অপরিচিত মনে হইল।

ব্রিজের মাঝামাঝি ইট, সুরকি আর সিমেন্টে গাঁথা ধারকস্তম্ভের শেষপ্রান্তে বসিয়া সে প্রতিদিন নদীকে দেখে। আজও সে সেইখানে গিয়া বসিল। নদীর স্রোত ব্রিজের এই দিকে ধারকস্তম্ভগুলিতে বাধা পাইয়া ফেনিল আবর্ত রচনা করিতেছে। এত উঁচুতে জল উঠিয়া আসিয়াছে যে, মনে হয় ইচ্ছা করিলে বুঝি হাত বাড়াইয়া স্পর্শ করা যায়। নদেরচাঁদের ভারী আমোদ বোধ হইতে লাগিল। পকেট খুঁজিয়া পুরাতন একটি চিঠি বাহির করিয়া সে স্রোতের মধ্যে ছুড়িয়া দিল। চোখের পলকে কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া গেল চিঠিখানা! উন্মত্ততার জন্যই জলপ্রবাহকে আজ তাহার জীবন্ত মনে হইতেছিল, তার সঙ্গে খেলায় যোগ দিয়া চিঠিখানা যেন তাড়াতাড়ি লুকাইয়া ফেলিয়াছে।

দুদিন ধরিয়া বাহিরের অবিশ্রান্ত বর্ষণের সঙ্গে সুর মিলাইয়া নদেরচাঁদ বউকে প্রাণপণে একখানা পাঁচপৃষ্ঠাব্যাপী বিরহ-বেদনাপূর্ণ চিঠি লিখিয়াছে, চিঠি পকেটেই ছিল। একটু মমতা বোধ করিল বটে, কিন্তু নদীর সঙ্গে খেলা করার লোভটা সে সামলাইতে পারিল না, এক একখানি পাতা ছিঁড়িয়া দুমড়াইয়া মোচড়াইয়া জলে

ফেলিয়া দিতে লাগিল।

তারপর নামিল বৃষ্টি, সে কী মুষলধারায় বর্ষণ! ঘণ্টা তিনেক বিশ্রাম করিয়া মেঘের যেন নূতন শক্তি সঞ্চিত হইয়াছে।

নদেরচাঁদ বসিয়া বসিয়া ভিজিতে লাগিল, উঠিল না। নদী হইতে একটা অশ্রুতপূর্ব শব্দ উঠিতেছিল, তাঁর সঙ্গে বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ মিশিয়া হঠাৎ এমন একটা সংগত সৃষ্টি করিয়াছে যে নদেরচাঁদের মন হইতে ছেলেমানুষি আমোদ মিলাইয়া গেল, তার মনে হইতে লাগিল এই ভীষণ মধুর শব্দ শুনিতে শুনিতে সর্বাঙ্গ অবশ, অবসন্ন হইয়া আসিতেছে।

ক্রমে ক্রমে দিনের স্তিমিত আলো মিলাইয়া চারিদিক অন্ধকারে ছাইয়া গেল, বৃষ্টি একবার কিছুক্ষণের জন্য একটু কমিয়া আবার প্রবলবেগে বর্ষণ আরম্ভ হইল, ব্রিজের উপর দিয়া একটা ট্রেন চলিয়া যাওয়ার শব্দে আকস্মিক আঘাতে ঘুম ভাঙিয়া যাওয়ার মতো একটা বেদনাদায়ক চেতনা কিছুক্ষণের জন্য নদেরচাঁদকে দিশেহারা করিয়া রাখিল, তারপর সে অতিকষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বড়ো ভয় করিতে লাগিল নদেরচাঁদের। হঠাৎ তাহার মনে হইয়াছে, রোষে ক্ষোভে উন্মত্ত এই নদীর আর্তনাদি জলরাশির কয়েক হাত উঁচুতে এমন নিশ্চিন্তমনে এতক্ষণ বসিয়া থাকা তাহার উচিত হয় নাই। হোক ইট, সুরকি, সিমেন্ট, পাথর, লোহালক্কড়ে গড়া ব্রিজ, যে নদী এমনভাবে খেপিয়া যাইতে পারে তাহাকে বিশ্বাস নাই।

অন্ধকারে অতি সাবধানে লাইন ধরিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে নদেরচাঁদ স্টেশনের দিকে ফিরিয়া চলিল। নদীর বিদ্রোহের কারণ সে বুঝিতে পারিয়াছে। ব্রিজটা ভাঙিয়া ভাসাইয়া লইয়া, দুপাশে মানুষের হাতে গড়া বাঁধ চুরমার করিয়া, সে স্বাভাবিক গতিতে বহিয়া যাইবার পথ করিয়া লইতে চায়। কিন্তু পারিবে কি?

পারিলেও মানুষ কি তাকে রেহাই দিবে? আজ যে ব্রিজ আর বাঁধ সে ভাঙিয়া ফেলিবে, কাল মানুষ আবার সেই ব্রিজ আর বাঁধ গড়িয়া তুলিবে। তারপর এই গভীর প্রশস্ত, জলপূর্ণ নদীর, তার দেশের সেই ক্ষীণস্রোতা নদীতে পরিণত হইতে না জানি মোটে আর কতদিন লাগিবে?

স্টেশনের কাছে নূতন রং করা ব্রিজটির জন্য এতকাল নদেরচাঁদ গর্ব অনুভব করিয়াছে। আজ তার মনে হইল কী প্রয়োজন ছিল ব্রিজের?

বোধহয়, এই প্রশ্নের জবাব দিবার জন্যই পিছন হইতে ৭নং ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি নদেরচাঁদকে পিষিয়া দিয়া চলিয়া গেল ছোটো স্টেশনটির দিকে, নদেরচাঁদ চার বছর যেখানে স্টেশনমাস্টারি করিয়াছে এবং বন্দি নদীকে ভালোবাসিয়াছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮—১৯৫৬) : জন্ম সাঁওতাল পরগনার দুমকায়। আদিনিবাস বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে। প্রকৃত নাম প্রবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্যরচনা করেছেন 'মানিক' নামে। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অঙ্কে অনার্স নিয়ে পড়ার সময় তাঁর প্রথম গল্প 'অতসী মামী', 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (১৯২৮)। একুশ বছর বয়সে প্রথম উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য' রচনা করেন। যদিও তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'জননী' (১৯৩৫)। তাঁর লেখা গল্পগ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে— 'অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প', 'প্রাগৈতিহাসিক', 'মিহি ও মোটা কাহিনি', 'সরীসৃপ', 'বৌ', 'সমুদ্রের স্বাদ', 'ভেজাল', 'হলুদ পোড়া', 'আজকাল পরশুর গল্প', 'পরিস্থিতি, ছোটোবড়ো', 'মাটির মাশুল', 'ছোটো বকুলপুরের যাত্রী', 'ফেরিওলা', 'লাজুকলতা' প্রভৃতি। 'পুতুল নাচের ইতিকথা' এবং 'পদ্মানদীর মাঝি' হলো তাঁর রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে সবচেয়ে সমাদৃত। 'লেখকের কথা' তাঁর লেখা প্রবন্ধের একটি উল্লেখযোগ্য সংকলন।

শিখন পরামর্শ

দশম শ্রেণির 'সাহিত্য সঞ্চয়ন' কোনো একটি নির্দিষ্ট ভাবমূলকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি। পাতাবাহার, সাহিত্য মেলা ও সাহিত্য সঞ্চয়ন (নবম শ্রেণি)— অর্থাৎ তৃতীয় থেকে নবম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত ভাবমূল (Theme) সমূহকে আরো প্রসারিত মাত্রায় ব্যবহার করা হয়েছে। ভাবমূলের বিন্যাস, শিক্ষাবর্ষের জন্য তিনটি পর্যায়ে অনুসরণীয় পাঠ্যসূচির বিভাজন ও নতুন পাঠক্রম অনুযায়ী প্রশ্নের কাঠামো এবং নম্বরের বিভাজন নীচে দেওয়া হলো :

সাহিত্য সঞ্চয়নের ভাবমূলের বিন্যাস :

পাঠের নাম	ভাবমূল
প্রথম পাঠ	অনুভূতির জগৎ
দ্বিতীয় পাঠ	চারপাশের পৃথিবী
তৃতীয় পাঠ	ইতিহাস ও সংস্কৃতি
চতুর্থ পাঠ	সাংস্কৃতিক বহুত্ব
পঞ্চম পাঠ	স্বদেশ ও স্বাধীনতা
ষষ্ঠ পাঠ	অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য
সপ্তম পাঠ	বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও মানবতা

শিক্ষাবর্ষে তিনটি পর্যায়ে বিন্যস্ত পাঠ্যসূচি :

পর্যায়	পাঠের নাম		
প্রথম পর্যায়ক্রমিক (পূর্ণমান ৪০ + অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন ১০)	আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি, জ্ঞানচক্ষু, আফ্রিকা, হারিয়ে যাওয়া কালিকলম, অসুখী একজন,	কারক ও অকারক সম্পর্ক এবং অনুবাদ	কোনি- ১-৩০ পাতা
দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক (পূর্ণমান ৪০ + অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন ১০)	বহুরূপী, অভিষেক, সিরাজদ্দৌলা, প্রলয়োল্লাস, পথের দাবী	সমাস এবং প্রতিবেদন	কোনি- ৩০-৪৯ পাতা
তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক/নির্বাচনী মূল্যায়ন (পূর্ণমান ৯০ + অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন ১০)	পাঠ্যসূচির অন্তর্গত সমস্ত রচনা	ব্যাকরণের ও নির্মিতির সমস্ত অধ্যায়	কোনি- সম্পূর্ণ বই

তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক/নির্বাচনী মূল্যায়নের জন্য প্রশ্নের কাঠামো ও নম্বর বিভাজন

	বহু বিকল্পীয় প্রশ্ন (MCQ)	অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন (Very short Answer Type)	ব্যাখ্যাভিত্তিক সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short and Explanatory)	রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay Type)	পূর্ণমান (Total)
গল্প	০৩	০৪	০৩	০৫	১৫
কবিতা	০৩	০৪	০৩	০৫	১৫
প্রবন্ধ	০৩	০৩	×	০৫	১১
নাটক	×	×	×	০৪	০৪
পূর্ণাঙ্গ সহায়ক গ্রন্থ	×	×	×	৫+৫=১০	১০
ব্যাকরণ	০৮	০৮	×	×	১৬
নির্মিতি	×	×	×	* প্রবন্ধ রচনা — ১০ * অনুবাদ — ০৪ সংলাপ রচনা অথবা প্রতিবেদন রচনা — ০৫	১৯

১০ নম্বরের প্রশ্নের জন্য : কম বেশি ৪০০ শব্দ
০৫ নম্বরের প্রশ্নের জন্য : কম বেশি ১৫০ শব্দ
০৪ নম্বরের প্রশ্নের জন্য : কম বেশি ১২৫ শব্দ
০৩ নম্বরের প্রশ্নের জন্য : কম বেশি ৬০ শব্দ
০১ নম্বরের প্রশ্নের জন্য : কম বেশি ২০ শব্দ

MCQ-এর ক্ষেত্রে কোনো বিকল্প প্রশ্ন থাকবে না। VSA এর ক্ষেত্রে গল্পের ৫টির মধ্যে ৪টি, কবিতার ৫টির মধ্যে ৪টি, প্রবন্ধের ৪টির মধ্যে ৩টি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে। SA এবং Essay type প্রশ্নের ক্ষেত্রে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক থেকে একটি করে বিকল্প থাকবে। পূর্ণাঙ্গ সহায়ক গ্রন্থ থেকে ৩টি Essay type প্রশ্নের মধ্যে দুটির উত্তর করতে হবে। ব্যাকরণ অংশের VSA এর ক্ষেত্রে ১০টির মধ্যে ৮টির উত্তর করতে হবে। ৪টি প্রবন্ধের মধ্যে থেকে ১টির উত্তর করতে হবে। অনুবাদের ক্ষেত্রে কোনো বিকল্প প্রশ্ন থাকবে না। সংলাপ অথবা প্রতিবেদন— যে কোনো ১টির উত্তর করতে হবে।

* নির্মিতি অংশে প্রবন্ধ ও অনুবাদের উত্তর প্রদান বাধ্যতামূলক।

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের প্রশ্নকাঠামো ও নম্বর বিভাজনের আনুপাতিক মান প্রযোজ্য হবে। এক্ষেত্রে যে যে বিষয় পাঠ্যসূচির অন্তর্গত থাকবে না তার মান প্রশ্নের অন্য বিষয়গুলিতে গুরুত্ব অনুসারে বণ্টিত হবে।

নতুন প্রশ্ন-কাঠামো অনুযায়ী প্রশ্নের নমুনা

১. ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো : **প্রতিটি প্রশ্নের মান-১**

১.১ 'বাসের যাত্রীরা কেউ হাসে, কেউ বা বেশ বিরক্ত হয় কেউ আবার বেশ বিস্মিত।'
বাসযাত্রীদের এমন প্রতিক্রিয়ার কারণ —
(ক) বাসের ড্রাইভার কাশীনাথ বহুরূপী হরিদাকে ধমক দিয়েছে। (খ) বহুরূপী হরিদার পাগলের সাজটা হয়েছে চমৎকার। (গ) হরিদা আজ একজন বাউল সেজে এসেছেন। (ঘ) কাপালিক সেজে এলেও হরিদা আজ কোনো পয়সা নিলেন না।

১.২ 'দাঁড়াও ওই মানহারা মানবীর দ্বারে'— উদ্বৃতাংশে 'মানহারা মানবী' বলতে বোঝানো হয়েছে
(ক) আফ্রিকা মহাদেশকে (খ) বসুধাকে, (গ) ভারতবর্ষকে, (ঘ) পশ্চিম দুনিয়াকে।

২. কমবেশি ২০ টি শব্দে উত্তর লেখো : **প্রতিটি প্রশ্নের মান-১**

২.১ 'আমার সঙ্গে আয়'—অমৃত ইসাবকে এমন নির্দেশ দিল কেন?

২.২ 'তোমায় নিয়ে বেড়াবে গান/নদীতে, দেশগাঁয়ে'—কীভাবে এমন পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলে তুমি মনে করো?

৩. প্রসঙ্গ নির্দেশসহ কম-বেশি ৬০টি শব্দে উত্তর লেখো : **প্রতিটি প্রশ্নের মান-৩**

৩.১ 'নদীর বিদ্রোহ' গল্পে নদীর বিদ্রোহী হয়ে ওঠার কারণ কী বলে তোমার মনে হয়?

৩.২ 'অতি মনোহর দেশ...।'
'সিন্ধুপারে' কবিতাংশ অনুসরণে মনোহর দেশটির বর্ণনা দাও।

৪. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো (কম-বেশি ১৫০ শব্দে) **প্রতিটি প্রশ্নের মান-৫**

৪.১ 'পোলিটিক্যাল সাসপেক্ট সব্যসাচী মল্লিককে নিমাইবাবুর সম্মুখে হাজির করা হইল।'—
এরপর পুলিশ-স্টেশনে কী পরিস্থিতি তৈরি হলো, তা পাঠ্যাংশ অনুসরণে আলোচনা করো। ৫

৪.২ 'তোরা সব জয়ধ্বনি কর'।
—কাদের উদ্দেশে কবির এই আহ্বান? কবিতার ভাববস্তু বিশ্লেষণ করে এই আহ্বানধ্বনির পুনরাবৃত্তির যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করো। ২ + ৩

৪.৩ 'আমরা কালিও তৈরি করতাম নিজেরাই।'— লেখক বর্ণিত কালি তৈরির পদ্ধতিটি বুঝিয়ে দাও। ৫

৪.৪ 'অনেকে মনে করেন পারিভাষিক শব্দ বাদ দিয়ে বক্তব্য প্রকাশ করলে রচনা সহজ হয়'।—মতটিকে তুমি কি সমর্থন করো? ৫

৫. কম-বেশি ১২৫ শব্দে উত্তর লেখো (যেকোনো একটি) : **প্রতিটি প্রশ্নের মান-৪**

৫.১ 'বাংলার মান, বাংলার মর্যদা, বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়াসে আপনারা আপনাদের শক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, সবরকমে আমাকে সাহায্য করুন।'—সিরাজ কাদের কাছে এই সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন? কেন তিনি এই সাহায্যের প্রত্যাশী হয়েছেন? ১ + ৩

৫.২ 'ঘরে-বাইরে প্রতিনিয়ত এই বাক্যজ্বালা আমি আর সইতে পারিনা লুৎফা!'— লুৎফা কে? বক্তার কথায় ঘরে-বাইরের কী ধরনের বাক্যজ্বালার প্রসঙ্গ নির্দেশিত হয়েছে? ১ + ৩

SAFE DRIVE SAVE LIFE

সাবধানে চালাও, জীবন বাঁচাও

SAFE DRIVE SAVE LIFE

৮ জুলাই ২০১৬ মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গোটা পশ্চিমবঙ্গ শপথ নিয়েছে পথ সংস্কৃতি মেনে চলার। এ শপথ ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলার। এ শপথ সর্তক হয়ে পথ চলার। পথের নিয়ম মেনে চলার লক্ষ্যে প্রশাসন, পুলিশ, পরিবহনকর্মী, পথচারী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা একসূত্রে গ্রন্থিত হোক। আমরা সিগন্যাল মেনে গাড়ি চালাব। আমরা উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে দুর্ঘটনা ডেকে আনব না। আমরা প্রতিদিন সুস্থ দেহে, নিরাপদে অপেক্ষারত প্রিয়জনদের কাছে ঘরে ফিরে আসব। এই শপথ একদিন-দু-দিন বা একটি সপ্তাহের নয় এ আমাদের আজীবনের অঙ্গীকার হোক। আসুন, আমরা সকলে মিলে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীপ্ত কণ্ঠে উচ্চারিত Safe Drive Save Life-এর অঙ্গীকার দৃঢ় করবার শপথ নিই। শপথটি নীচে দেওয়া হলো—

আমাদের প্রতিজ্ঞা

পথ সংস্কৃতি জানব
ট্রাফিক নিয়ম মানব
আমি সতর্ক হয়ে চলব
সুস্থভাবে এগিয়ে যাব
পথকে জয় করব
শান্ত জীবন গড়ব
পথ শুধু আমার নয়
এ পথ মোদের সবার
তা সর্বদা মনে **রাখব**।